Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রাফিউল হাসান
রোলঃ **23100110384**

০২ জুন, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রাফিউল হাসান
রোলঃ **23100110384**

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ রাফিউল হাসান, আইডিঃ 23100110384 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নেঃ	এক্সটারনালঃ
মাওলানা রাহাত আহমাদ	মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।	দাওয়াহ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম	ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোঃ রাফিউল হাসান

তারিখঃ
০২ জুন, ২০২৬ ইং

মোঃ রাফিউল হাসান
আইডিঃ **23100110384**
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় একঃ ভূমিকা **6**

১.১ ভূমিকা 6

১.২ গবেষণার পটভূমি 7

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব 8

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য 9

অধ্যায় দুইঃ ইসলামি শাসনব্যবস্থার ধারনা, পরিচিতি ও ভিত্তি **10**

২.১ ইসলামি শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা 10

২.২ শাসন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 10

২.৩ কুরআনের আলোকে শাসনতত্ত্ব 10

২.৪ হাদিসের আলোকে শাসনব্যবস্থা 11

২.৫ ইসলামি শাসনের মূলনীতিসমূহ 12

২.৬ ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো 13

অধ্যায় তিনঃ খিলাফতের ধারণা ও ইতিহাস **14**

৩.১ "খিলাফত" ও "খলিফা" শব্দের বিশ্লেষণ 14

৩.২ খিলাফতের শর্তাবলি ও খলিফার যোগ্যতা 15

৩.৩ খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য 15

৩.৪ খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি 16

৩.৫ খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনব্যবস্থা 17

৩.৬ উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত: পরিবর্তন ও বিবর্তন 21

৩.৭ উসমানীয় খিলাফত ও তার অবসান 24

অধ্যায় চারঃ ইসলামি শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতিসমূহ **26**

৪.১ তাওহীদ এবং আল্লাহর চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব 26

৪.২ খিলাফত ও আমানতদারী: জবাবদিহিতামূলক প্রতিনিধিত্ব 26

৪.৩ মজলিশ-উশ-শূরা: প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শ ব্যবস্থা 27

৪.৪ আল-'আদালাহ: নিরপেক্ষ ও পরম ন্যায়বিচার 27

৪.৫ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা এবং নাগরিক সমতা 28

৪.৬ হিসবাহ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র 29

অধ্যায় পাঁচঃ ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক ও নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব 30

৫.১ ভূমিকা 30

৫.২ ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি..... 30

৫.৩ শাসকের যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলি 31

৫.৪ শাসকের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য 31

৫.৫ শাসকের আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার 33

৫.৬ নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার..... 34

৫.৭ নাগরিকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব 35

৫.৮ ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা..... 35

৫.৯ ইসলামি রাষ্ট্রনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান 38

৫.১০ রাষ্ট্র ও জনগণের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি..... 41

অধ্যায় ছয়ঃ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইসলামি খিলাফতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ..... 43

৬.১ ভূমিকা..... 43

৬.২ ক্ষমতার উৎস ও পরিচালনা পদ্ধতি: গণতন্ত্র বনাম খিলাফত..... 43

৬.৩ সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) এবং আইনের উৎস..... 44

৬.৪ নেতৃত্ব নির্বাচন, জবাবদিহিতা ও মেয়াদকাল..... 44

৬.৫ ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ইসলামি রাষ্ট্রনীতি..... 45

৬.৬ আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় খিলাফতের প্রভাব 46

৬.৭ সমসাময়িক বিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা ও চ্যালেঞ্জ..... 48

৬.৮ সমসাময়িক কেস স্টাডি: ইসলামি রাষ্ট্রনীতির ভিন্নধর্মী প্রায়োগিক রূপ 50

অধ্যায় সাতঃ গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ..... 53

৭.১ ভূমিকা..... 53

৭.২ গবেষণার মূল ফলাফলসমূহ (Key Findings)..... 53

৭.৩ ক্ষমতার উৎস ও আইনি কাঠামোগত ভিন্নতা 54

৭.৩ ক্ষমতার উৎস ও আইনি কাঠামোগত ভিন্নতা 55

অধ্যায় আটঃ উপসংহার ও সুপারিশমালা 57

৮.১ গবেষণালব্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত..... 57

৮.২ সুপারিশমালা..... 58

তথ্যসূত্র 61

অধ্যায় এক
ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

মানব ইতিহাসে ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফতের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র থেকে শুরু করে খুলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগ, উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং পরবর্তীকালের খিলাফত—এই ধারাবাহিকতা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার ইতিহাস নয়, বরং ন্যায়বিচার, জনকল্যাণ, আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুগত উন্নয়নের এক অসাধারণ সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

“আর আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন।”

– সূরা আন-নূর : ৫৫

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য এমন একটি শাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে ন্যায়, সত্য ও দ্বীনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলামি খিলাফতের ভিত্তি হলো তাওহীদ, ন্যায়বিচার, পরামর্শ (শূরা), জবাবদিহিতা এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণ।

আজকের বিশ্বে, যেখানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে, সেখানে খিলাফত ও ইসলামি শাসন ব্যবস্থা আবার নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। কেউ এটিকে দেখেন ঐতিহাসিক অতীতের স্মৃতি হিসেবে, কেউবা দেখেন ভবিষ্যতের এক আদর্শ শাসনব্যবস্থা হিসেবে। কেউ এর মধ্যে খুঁজে পান মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের উৎস, আবার কেউ দেখেন ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের ঝুঁকি। এই বৈপরীত্যের মাঝে সত্য অনুসন্ধান করা আজকের মুসলিম যুবক-যুবতীদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

খিলাফত কেবল একজন ব্যক্তির শাসন নয়; এটি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের (খলিফাতুল্লাহ) দায়িত্ব পালনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এর মূলে রয়েছে সার্বভৌমত্বের একক উৎস—আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (হাকিমিয়্যাহ)। এই ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে শাসকের জবাবদিহিতা, আইনের উর্ধ্বে কোনো ব্যক্তির স্থান না থাকা, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, নৈতিক রাষ্ট্র ও জনগণের অধিকার সংরক্ষণের এক বিস্তৃত কাঠামো।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

“তোমাদের উপর আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অনুসরণ করা আবশ্যক।”

– সুনানে আবূ দাউদ

খিলাফতের ইতিহাসে আমরা দেখি—একদিকে হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায়পরায়ণতা ও জনকল্যাণমূলক শাসন, অন্যদিকে বাগদাদ ও কর্ডোবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন, যা ইউরোপীয় রেনেসাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

বর্তমান যুগে জাতিরাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফতের ধারণা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এটি কি শুধুই একটি ঐতিহাসিক মডেল, নাকি সমকালীন সমস্যার একটি বিকল্প সমাধান হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদেরকে ইসলামের মৌলিক উৎস—কুরআন, সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুশীলন এবং পরবর্তী যুগের অভিজ্ঞতা—সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

এই থিসিসে আমি ইসলামি শাসন ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি, খিলাফতের ঐতিহাসিক বিকাশ, তার শাসনকাঠামো, সাফল্য-ব্যর্থতা এবং আধুনিক বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। উদ্দেশ্য শুধু ইতিহাস বর্ণনা করা নয়, বরং একটি ন্যায়সঙ্গত, নৈতিক ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার সম্ভাবনাকে আলোকিত করা।

১.২ গবেষণার পটভূমি

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফতের ধারণা ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“আর যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামাজ কায়েম করে এবং যাদের কাজকর্ম তাদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।”

(সূরা আশ-শূরা: ৪২:৩৮)।

হিজরি প্রথম শতাব্দীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্র এই শাসনব্যবস্থার প্রথম ও সর্বোত্তম বাস্তব মডেল। খুলাফায়ে রাশেদীনের (রা.) স্বর্ণযুগে এই ব্যবস্থা তার চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

“খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে, তারপর রাজতন্ত্র আসবে।”

(সুনান তিরমিযী, হাসান)।

পরবর্তীকালে উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতিমীয় এবং উসমানীয় খিলাফতের মাধ্যমে প্রায় তেরশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানিক ধারা বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বজায় ছিল। ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তির পর ঔপনিবেশিকোত্তর যুগে জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও, তা মুসলিম সমাজে ন্যায়বিচার, নৈতিকতা ও উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যথাযথ সফলতা দেখাতে পারেনি। ফলে গত কয়েক দশকে খিলাফত ও ইসলামি শাসন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন নিয়ে তীব্র আলোচনা দেখা দিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় জাতিরাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নৈতিক সংকট এবং মুসলিম বিশ্বের বিভক্তি এই বিষয়টিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণার গুরুত্ব বহুমাত্রিক এবং সমকালীন প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

- **তাত্ত্বিক গুরুত্ব:** কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফতের ধারণাকে সুসংগঠিত তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খিলাফত দান করেছিলেন।”

(সূরা আন-নূর: ২৪:৫৫)।

এই আয়াত ইসলামি শাসনের ঐশী ভিত্তি তুলে ধরে।

- **সমকালীন গুরুত্ব:** আজকের মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি ও উম্মাহর ঐক্যের অভাবের প্রেক্ষিতে এই গবেষণা একটি বিকল্প কল্যাণমুখী শাসনদর্শন উপস্থাপন করতে সক্ষম।

- **একাডেমিক গুরুত্ব:** বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ও গভীর গবেষণার অভাব রয়েছে। এই থিসিস সেই শূন্যস্থান পূরণে সহায়ক হবে।
- **সামাজিক গুরুত্ব:** যুবসমাজের মধ্যে সঠিক ধারণা তৈরি করে চরমপন্থী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

সাধারণ উদ্দেশ্য:

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফতের তাত্ত্বিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক বিকাশ, প্রয়োগিক বাস্তবতা এবং আধুনিক বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা।

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ:

কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা (হাকিমিয়্যাহ, শূরা, আদল, মসাওয়াত) বিশ্লেষণ করা। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো কাজকর্মে...”

(সূরা আলে ইমরান: ৩:১৫৯)।

খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে উসমানীয় খিলাফত পর্যন্ত খিলাফতের ঐতিহাসিক বিকাশ, পরিবর্তন ও রূপান্তর পর্যালোচনা করা।

ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রশাসনিক, বিচারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো উন্মোচন করা।

খিলাফত ব্যবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করা।

বর্তমান জাতিরাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও গ্লোবালাইজেশনের প্রেক্ষাপটে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা ও সম্ভাব্য প্রয়োগযোগ্যতা মূল্যায়ন করা।

বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার সম্ভাব্য রূপরেখা প্রস্তাব করা। এই গবেষণা শুধু ঐতিহাসিক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ না থেকে বর্তমান সংকটের সমাধান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা প্রদান করবে, ইন শা আল্লাহ।

অধ্যায় দুই
ইসলামি শাসনব্যবস্থার ধারনা, পরিচিতি ও ভিত্তি

২.১ ইসলামি শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা

ইসলামি শাসনব্যবস্থা বলতে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনকাঠামোকে বোঝায়, যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (হাকিমিয়্যাহ) সর্বোচ্চ ও অবিসংবাদিত বলে স্বীকৃত হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয় কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশনা অনুসারে।

ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা হলো

“আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ অনুসারে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালনার একটি নৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা”।

এটি কোনো সাধারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়; বরং এটি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধনের এক ঐশী পদ্ধতি। মাওলানা আবুল আ’লা মওদূদী এটিকে “থিও-ডেমোক্রেসি” (Theo-Democracy) বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে আল্লাহ আইন প্রণেতা এবং জনগণ শাসকের নয়, বরং আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। (মওদূদী, আবুল আ’লা। *খিলাফত ও রাজতন্ত্র*।)

২.২ শাসন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে শাসনব্যবস্থাকে একটি দ্বৈত সত্তা হিসেবে দেখা হয়: এটি একই সাথে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। "দ্বীন" ধারণাটি ইসলামে কেবল আনুষ্ঠানিক উপাসনাকে নির্দেশ করে না, বরং জীবনের সামগ্রিক পথ ও পদ্ধতিকে বোঝায়। এই সামগ্রিক জীবনদর্শনের অংশ হিসেবে ইসলাম রাষ্ট্র ও শাসনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়।

ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইমাম আল-গাজালি বলেছেন:

"দ্বীন হলো ভিত্তি আর সুলতান (রাষ্ট্র) হলো পাহারাদার। যার ভিত্তি নেই তা ধ্বংস হয়, আর যার পাহারাদার নেই তা হারিয়ে যায়"

[1]

২.৩ কুরআনের আলোকে শাসনতত্ত্ব

কুরআনুল কারিমে শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত অনেক আয়াত রয়েছে যা ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত (দায়িত্ব) তার প্রকৃত অধিকারীদের কাছে অর্পণ করবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে"

(সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের আনুগত্য করো"

(সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯)।

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"আর তাদের কার্যাবলি পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়"

(সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩৮)।

এই আয়াতগুলো থেকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার তিনটি মূলস্তম্ভ স্পষ্ট হয়: আমানত তথা দায়িত্বশীলতা, আদালত তথা ন্যায়বিচার এবং শূরা তথা পরামর্শ। ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই তিনটি নীতিকে ইসলামি শাসনের ত্রিভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। [2]

২.৪ হাদিসের আলোকে শাসনব্যবস্থা

হাদিসের সাহিত্যে শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। শাসক তার প্রজাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮২৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

"সর্বোত্তম নেতা হলো তারা যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে; তোমরা তাদের জন্য দোয়া করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮৫৫)।

এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি তার নেতার কোনো বিষয় অপছন্দ করে, সে যেন ধৈর্য ধরে; কারণ যে ব্যক্তি সুলতানের বিরুদ্ধে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুতে মরে"

(সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭০৫৩)।

এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় যে ইসলামে শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং শাসক ও শাসিত উভয়েরই পারস্পরিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

২.৫ ইসলামি শাসনের মূলনীতিসমূহ

ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূলনীতিগুলো কুরআন ও হাদিস থেকে নিঃসৃত। এই নীতিগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

- **তাওহিদ ও সার্বভৌমত্ব:** ইসলামে সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ বলেছেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"বিধান দেওয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া কারো নেই"

(সূরা আল-আনআম, ৬:৫৭)।

এই নীতি অনুযায়ী কোনো মানুষ বা প্রতিষ্ঠান নিরঙ্কুশ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে না।

- **আদালত (ন্যায়বিচার):** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামি রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার ও আত্মীয়কে দান করার নির্দেশ দেন"

(সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০)।

- **শূরা (পরামর্শ):** ইসলামি শাসনে জনপ্রতিনিধিত্ব ও পরামর্শের বিধান রয়েছে। আল্লাহ নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো"

(সূরা আল-ইমরান, ৩:১৫৯)।

- **মাসলাহা (জনকল্যাণ):** জনকল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামি শাসনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। ইসলামি ফিকহে এই নীতিকে মাসলাহা মুরসালা বলা হয়, যা শরিয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেকোনো জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের অনুমতি দেয় [3]
- **আমানত (বিশ্বাসযোগ্যতা):** রাষ্ট্রক্ষমতা একটি আমানত। শাসক এই আমানত জনগণের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর কাছে এই বিষয়ে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

২.৬ ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো

ইসলামি রাষ্ট্রের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করে।

প্রথমত, সকলের জন্য আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করা। ইসলামে শাসক ও সাধারণ নাগরিক উভয়ের ক্ষেত্রেই একই আইন প্রযোজ্য।

হযরত উমর (রা.)-এর বিখ্যাত উক্তি:

"আমি যদি জুলুম করি তুমি আমাকে তলোয়ার দিয়ে সোজা করে দেবে।"

দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার রক্ষার বিধান রয়েছে। যিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) ব্যবস্থায় তাদের জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষিত। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য যাকাত, সদকা ও মাল-ই-ফাই বিতরণের সুষম ব্যবস্থা। [4]

অধ্যায় তিন

খিলাফতের ধারণা ও ইতিহাস

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

(হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি, কাজেই মানুষের মধ্যে সত্য দিয়ে বিচার করো)

(সূরা সাদ, ৩৮:২৬)

❖

৩.১ "খিলাফত" ও "খলিফা" শব্দের বিশ্লেষণ

আরবি ভাষায় "খিলাফত" শব্দটি "খলফ" মূল থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উত্তরসূরি হওয়া বা কারো পরিবর্তে কাজ করা। পারিভাষিক অর্থে খিলাফত হলো নবুয়তের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে মুসলিম উম্মতের সার্বিক নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব। ইমাম আল-মাওয়ার্দি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ'**-তে ইমামত বা ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

অর্থাৎ "**ইমামত বা খিলাফত হলো নবুয়তের উত্তরাধিকার, যার উদ্দেশ্য দ্বীন রক্ষা করা ও দুনিয়ার শাসন পরিচালনা**" [5]।

কুরআনে "খলিফা" শব্দটি দুইটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আর স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন: আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি"

(সূরা আল-বাকারা, ২:৩০)।

দ্বিতীয়ত:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি"

(সূরা সাদ, ৩৮:২৬)।

এই আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে খিলাফতের মূল ধারণাটি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সাথে সম্পর্কিত।

৩.২ খিলাফতের শর্তাবলি ও খলিফার যোগ্যতা

ইসলামি ফিকহবিদরা খলিফার জন্য কয়েকটি মূল শর্ত নির্ধারণ করেছেন। ইমাম আল-মাওয়ার্দি সাতটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেনঃ

- ন্যায়বিচারের গুণাবলি সম্পন্ন হওয়া;
- ইজতিহাদের যোগ্য হওয়ার মতো জ্ঞান থাকা;
- শ্রবণ ও দর্শন শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকা;
- বাক্‌শক্তি থাকা;
- দেহিক সুস্থতা থাকা;
- প্রশাসনিক দক্ষতা থাকা;
- কুরাইশ বংশীয় হওয়া।

তবে শেষ শর্তটি নিয়ে পরবর্তী আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং অনেকে এটিকে আবশ্যকীয় শর্ত মনে করেন না । [6]

৩.৩ খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল-মাওয়ার্দি খলিফার দশটি প্রধান দায়িত্ব চিহ্নিত করেছেন। ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই দশটি দায়িত্বকে **"ওয়াজিফাতুল ইমাম" (ইমামের দায়িত্বসমূহ)** হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই দায়িত্বগুলোকে মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ধর্মীয় দায়িত্ব (Religious Duties)

- **দ্বীন ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা:** ইসলামের মৌলিক আকীদা ও শরিয়তের বিধানকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।
- **শরয়ি হদ প্রয়োগ:** আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা ও দণ্ডবিধি (হদ) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে অপরাধ দমন করা।

২. বিচারিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Judicial & Internal Security)

- **ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ:** মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং বিচারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসা করা।
- **প্রজাদের নিরাপত্তা:** জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা দিয়ে নাগরিকদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের পরিবেশ তৈরি করা।
- **বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ:** যোগ্য, আমানতদার ও দক্ষ ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও বিচারিক পদে নিয়োগ দেওয়া।
- **ব্যক্তিগত তদারকি:** সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজের ওপর শাসক নিজে সরাসরি নজরদারি রাখা, যেন কর্মচারীরা অলসতা বা দুর্নীতি করতে না পারে।

৩. প্রতিরক্ষা, অর্থ ও পররাষ্ট্রনীতি (Defense & Fiscal Policy)

- **সীমান্ত রক্ষা:** শত্রুভাবাপন্ন দেশের আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রের সীমানা সুরক্ষিত রাখা।
- **জিহাদ পরিচালনা:** ইসলাম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দমন এবং দ্বীনের দাওয়াত প্রসারে নেতৃত্ব দেওয়া।
- **কর ও গণিমত সংগ্রহ:** শরিয়তসম্মত উপায়ে যাকাত, খরাজ, জিজিয়া ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত) সংগ্রহ করা।
- **রাষ্ট্রীয় বেতন ও ব্যয় নির্ধারণ:** বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে সরকারি কর্মচারী, সৈনিক ও জনগণের জন্য সঠিক সময়ে ভাতার ব্যবস্থা করা।

ইমাম আল-মাওয়ার্দির এই নীতিমালা প্রমাণ করে যে, ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা নন, বরং তিনি জনগণের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। [7]

৩.৪ খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি

ইসলামি ইতিহাসে খলিফা নির্বাচনের তিনটি পদ্ধতি দেখা গেছে। যা মূলত মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষা এবং যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

১. যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচন (আহলুল হল ওয়াল আকদ)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর উম্মাহর জরুরি পরিস্থিতিতে মদিনার প্রভাবশালী ও প্রাজ্ঞ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সাকিফাহ বনি সা'ইদাহ-তে একত্রিত হন। তাঁরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে **হযরত আবু বকর (রা.)**-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেন। পরে সাধারণ মুসলমানরা বায়আত বা আনুগত্যের শপথ নিয়ে এই নির্বাচনে পূর্ণ সমর্থন জানান।

২. পূর্বতন খলিফার মনোনয়ন বা অসিয়ত

নিজের মৃত্যুর আগে মুসলিম সমাজের ভেতরে যেন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা নেতৃত্ব সংকট তৈরি না হয়, সেজন্য **হযরত আবু বকর (রা.)** শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের সাথে ব্যাপক পরামর্শ করেন। সবার ইতিবাচক মতামতের ভিত্তিতে তিনি তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে **হযরত উমর (রা.)**-এর নাম প্রস্তাব বা মনোনয়ন করে যান।

৩. শূরা কমিটি (পরামর্শ সভা) গঠন

হযরত উমর (রা.) এককভাবে কাউকে মনোনীত না করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও গণতান্ত্রিক পথ বেছে নেন। তিনি তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও যোগ্য ৬ জন শীর্ষ সাহাবিকে নিয়ে একটি ‘শূরা কমিটি’ গঠন করে দেন। এই কমিটির পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত হন।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন তাঁর *মুকাদ্দিমাহ* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, পদ্ধতি যেটাই হোক না কেন—সবগুলোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল জনগণের সম্মতি আদায়, উম্মাহর ঐক্য ধরে রাখা এবং যোগ্যতম মানুষের হাতে শাসনভার তুলে দেওয়া। [৪]

৩.৫ খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনব্যবস্থা

খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনামল (৬৩২–৬৬১ খ্রি.) ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এই যুগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন:

"আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬০৭)।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (৬৩২-৬৩৪):

খিলাফতের প্রথম দিনই তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ইসলামি শাসনব্যবস্থার একটি অনন্য দলিল। তিনি বলেছিলেন:

"আমি তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি যদি সঠিক কাজ করি, তাহলে আমাকে সহায়তা করো। আর আমি যদি ভুল করি, তাহলে আমাকে সংশোধন করে দাও। সত্যবাদিতা আমানত আর মিথ্যা খিয়ানত।"

(ইবনে হিশাম, সিরাতুন নাবাবী, খণ্ড ৪)।

আবু বকর (রা.)-এর শাসনকাল সংক্ষিপ্ত হলেও এই স্বল্প সময়ে তিনি যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।

অভ্যন্তরীণ সংকট ও রিদ্দার যুদ্ধ (The Ridda Wars and Territorial Integrity) পদভার গ্রহণের পরপরই হযরত আবু বকর (রা.) এক অভূতপূর্ব অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখোমুখি হন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের সুযোগ নিয়ে আরবের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে ইসলাম ত্যাগ (Apostasy), যাকাত দিতে অস্বীকৃতি এবং ভণ্ড নবীদের উত্থানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ বা 'রিদ্দার ফিতনা' শুরু হয়। খলিফা আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কঠোর ও সুসংগঠিত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, 'রিদ্দার যুদ্ধ' (Wars of Apostasy) কেবল ধর্মীয় কারণে নয়, বরং নবগঠিত রাষ্ট্রের অখণ্ডতা (Territorial Integrity) ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছিল।

কুরআন সংকলনের ঐতিহাসিক উদ্যোগ (First Compilation of the Holy Quran) হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবদান হলো পবিত্র কুরআনের প্রথম গ্রন্থবদ্ধ রূপ বা অনুলিপি (Codex) প্রস্তুত করা। রিদ্দার যুদ্ধের অন্যতম অংশ 'য়ামামার যুদ্ধে' বিপুল সংখ্যক হাফেজে কুরআন শহীদ হলে হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শে খলিফা আবু বকর (রা.) এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রধান ওহী লেখক জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি অত্যন্ত কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুরআনের আয়াতগুলোকে একত্রিত করে ইতিহাসের প্রথম আনুষ্ঠানিক গ্রন্থবদ্ধ রূপ (মুসহাফ) তৈরি করে, যা খলিফার দাপ্তরিক হেফাজতে রাখা হয়। [9,10]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) (৬৩৪–৬৪৪):

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকাল ছিল সামরিক সাফল্য এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। তাঁর যুগান্তকারী রণকৌশল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে তৎকালীন বিশ্বের দুটি পরাশক্তি—বাইজেন্টাইন (রোমান) ও সাসানীয় (পারসিক) সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই সময়ে সমগ্র সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, ইরাক এবং পারস্যের (ইরান) বিশাল অঞ্চল ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫ হিজরিতে (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) জেরুজালেম বিজয় এবং ঐতিহাসিক বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসা এই আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূ-রাজনৈতিক ঘটনা। **প্রশাসনিক সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি** (Administrative Reforms and Institutionalization) হযরত উমর (রা.) কেবল একজন বিজয়ী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপকার। বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য তিনি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করে গভর্নর (ওয়ালি) ও বিচারক (কাজী) নিয়োগের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে স্বাধীন করেন। এছাড়া তিনি একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন, প্রথম রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল), রাজস্ব ও শুল্ক বিভাগ (দেওয়ান), আদমশুমারি, পুলিশ বাহিনী এবং নৈশকালীন টহল ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর আমলেই হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'হিজরি সন' বা ইসলামী বর্ষপঞ্জির আনুষ্ঠানিক গণনা শুরু হয়। [11,12]

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) (৬৪৪–৬৫৬):

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম চার খলিফার (খুলাফায়ে রাশেদিন) মধ্যে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর শাসনকাল ছিল দীর্ঘতম এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত, দীর্ঘ ১২ বছর তিনি এই বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। **প্রথম ৬ বছর (শান্তি ও বিস্তার):** এই সময়কাল ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং জনপ্রিয়। ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা পারস্য, উত্তর আফ্রিকা ও সাইপ্রাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। **শেষ ৬ বছর (অস্থিরতা ও ফিতনা):** এই সময়ে কিছু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অসন্তোষ, ভুল বোঝাবুঝি এবং বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের কারণে রাষ্ট্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। **প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী অবদান** (Institutional and Lasting Contributions) রাজনৈতিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকাল দুটি যুগান্তকারী প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমত, তাঁর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক অবদান হলো পবিত্র কুরআনের প্রামাণ্য একক লিখিত সংস্করণ (মুসহাফ-ই-উসমানী) চূড়ান্তকরণ। আঞ্চলিক উপভাষা ও পাঠভেদ দূর করে কুরাইশ উপভাষার ভিত্তিতে

কুরআনের এই মানক অনুলিপি তৈরি করে তিনি বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন, যা মুসলিম বিশ্বের ঐক্য বজায় রাখতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের নৌ-আক্রমণ প্রতিহত করতে তাঁর আমেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম আনুষ্ঠানিক এবং শক্তিশালী নৌবাহিনী (First Muslim Navy) গঠিত হয়। [11,13]

হযরত আলী ইবন আবি তালিব (রা.) (৬৫৬-৬৬১)

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর নির্মম শাহাদাতের পর মদিনায় যখন চরম রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করছিল, সে সময়ে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) চতুর্থ খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রভার গ্রহণ করেন। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত শাসনকালটি প্রথম মুসলিম গৃহযুদ্ধ বা 'প্রথম ফিতনা' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল।

প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও রাজধানী স্থানান্তর

ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই হযরত আলী (রা.) রাষ্ট্রে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে পূর্ববর্তী আমলের বেশ কিছু প্রাদেশিক গভর্নরকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। একই সাথে তিনি রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু ও ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত সুবিধার কথা বিবেচনা করে ইসলামের প্রথম প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের কুফায় স্থানান্তর করেন। এই পদক্ষেপটি সামরিক ও দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কুফাকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত করে।

অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক ফিতনা

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল জুড়েই উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার (কিসাস) নিয়ে চরম রাজনৈতিক মেরুকরণ ও মতবিরোধ দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বড় ধরনের গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমত, ৩৬ হিজরিতে উটের যুদ্ধ (Battle of Camel) এবং পরবর্তীতে ৩৭ হিজরিতে সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে সিফফিনের যুদ্ধ (Battle of Siffin) সংঘটিত হয়। সিফফিনের যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে 'তাহকিম' বা সালিশি মীমাংসার (Arbitration) প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কারণে হযরত আলী (রা.)-এর নিজের দল থেকে একটি উগ্রপন্থী দল বের হয়ে যায়, যারা ইতিহাসে 'খারেজী' (Kharijites) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এই খারেজীদের বিরুদ্ধে খলিফাকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধ (Battle of Nahrawan) পরিচালনা করতে হয়।

আর্থিক নীতি ও সামাজিক বিচার

তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) কঠোর অর্থনৈতিক সততা ও সামাজিক সমতা বজায় রেখেছিলেন। তিনি 'বাইতুল মাল'-এর অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক বা গোত্রীয় মর্যাদার পরিবর্তে সমতার নীতি (Egalitarian Distribution) কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, দরিদ্র ও অমুসলিম নাগরিকদের নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রতি তীব্র তদারকি বজায় রাখতেন, যার অনন্য দলিল হিসেবে ঐতিহাসিকরা মিশর ও বসরার গভর্নরদের প্রতি লেখা তাঁর প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা ও চিঠিগুলোকে বিবেচনা করেন। [14,15,16]

৩.৬ উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত: পরিবর্তন ও বিবর্তন

উমাইয়া খিলাফতের (৬৬১–৭৫০ খ্রি.) সূচনা ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনে সবচেয়ে বড় বাঁক-বদল হিসেবে চিহ্নিত। এই রূপান্তরটি কেবল শাসকের পরিবর্তন ছিল না, বরং তা ছিল রাষ্ট্রীয় বৈধতার উৎসের পরিবর্তন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং পরবর্তীতে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)- এর "খিলাফত ও রাজতন্ত্র" গ্রন্থে রাজনৈতিক ফিকহ বা 'আল-সিয়াসা আল-শরিয়াহ' (Siyasa al-Shar'iyya)-এর আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উমাইয়া যুগে ইসলামি শাসনব্যবস্থা তার বিশুদ্ধ 'শুরা' (পরামর্শভিত্তিক) ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে (Mulkiyyah) পদার্পণ করে। তবে এই রূপান্তর সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না, বরং এতে কিছু মূল ইসলামি আইনি কাঠামো অপরিবর্তিত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী:

"আমার উম্মতে খিলাফত হবে ত্রিশ বছর, অতঃপর সেটা মুলুকিয়াতে রূপান্তরিত হবে"

(সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ২২২৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬৪৬)।

ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের মতে, এই ৩০ বছর খুলাফায়ে রাশেদার শাসনকালকে নির্দেশ করে:

- **হযরত আবু বকর (রা.)**: ২ বছর ৩ মাস
- **হযরত ওমর (রা.)**: ১০ বছর ৬ মাস
- **হযরত ওসমান (রা.)**: ১২ বছর

- **হযরত আলী (রা.)**: ৪ বছর ৯ মাস
- **হযরত হাসান (রা.)**: ৬ মাস (যার মাধ্যমে ৩০ বছর পূর্ণ হয় এবং তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে উম্মাহর ঐক্য ফেরান)।

এই ৩০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৪১ হিজরি (৬৬১ খ্রি.) থেকে উমাইয়া রাজবংশের মাধ্যমে ইসলামি রাজনীতিতে 'মুলুকিয়া' বা রাজতান্ত্রিক ধারার প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ঘটে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রাজনৈতিক দর্শন: খিলাফত বনাম রাজতন্ত্র

বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও ফকীহ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর রাজনৈতিক ফিকহ বা 'আল-সিয়াসা আল-শরিয়াহ' (Siyasa al-Shar'iyya)-এ উমাইয়াদের এই রূপান্তরকে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর "খিলাফত ও রাজতন্ত্র" সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে প্রধান তিনটি দিক উন্মোচিত হয়:

ক. শুরা ব্যবস্থার অবলুপ্তি ও বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার:

খুলাফায়ে রাশেদার মূল ভিত্তি ছিল 'শুরা' (জনগণের স্বাধীন মতামত ও পরামর্শ) এবং অবাধ 'বাইয়াত' (আনুগত্যের শপথ)। ইবনে তাইমিয়াহর মতে, উমাইয়ারা ক্ষমতা গ্রহণের পর শুরার স্থান দখল করে ‘বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার’ (Hereditary Succession) নীতি, যা রাজতন্ত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

খ. ক্ষমতার উৎসের পরিবর্তন

রাশেদীন যুগে খিলাফতের ক্ষমতার উৎস ছিল ধর্মীয় নৈতিকতা, তাকওয়া এবং জনসম্মতি। উমাইয়া যুগে তা প্রধানত সামরিক শক্তি এবং গোত্রীয় রক্তসম্পর্ক ও আনুগত্যের (*আসাবিয়াহ*) ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

গ. শরিয়াহর আইনি কাঠামো রক্ষা

ইবনে তাইমিয়াহ জোর দিয়ে বলেছেন যে, উমাইয়া খিলাফত রাজতন্ত্রে রূপ নিলেও তা সম্পূর্ণরূপে ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। শাসকগণ ব্যক্তিগতভাবে রাজকীয় আড়ম্বর ধারণ করলেও রাষ্ট্রে শরিয়াহর বিচারব্যবস্থা, হজ্জ, জুমার সালাত, জিহাদ এবং দ্বীনের মৌলিক স্তম্ভগুলো বলবৎ রেখেছিলেন। তাই ইসলামি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটিকে 'জাহেলিয়াত' না বলে, "**الملك العضوض**" **(কামড়ানো বা কঠোর রাজতন্ত্র)** অথবা ইসলামি আইনি কাঠামোর ভেতরেই এক ধরণের ‘প্রশাসনিক বিবর্তন’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ঘ. কাঠামোগত তুলনামূলক চিত্র (Structural Contrast)

বিবর্তনের সূচক	খুলাফায়ে রাশেদা (আদর্শ খিলাফত)	উমাইয়া খিলাফত (মুলুকিয়া/রাজতন্ত্র)
বৈধতার ভিত্তি	শুরা, জনসম্মতি ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব।	সামরিক শক্তি, গোত্রীয় সংহতি ও বংশমর্যাদা।
উত্তরাধিকার নীতি	যোগ্যতা ও শুরার ভিত্তিতে (বংশানুক্রমিক নয়)।	রাজতান্ত্রিক উত্তরাধিকার (পিতা থেকে পুত্রে)।
কোষাগার (বায়তুল মাল)	জনগণের আমানত; খলিফারা কঠোর হিসাব দিতেন।	রাজপরিবারের সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় তহবিলের মিশ্রণ।
আইনের শাসন	খলিফা আদালতের ঊর্ধ্বে ছিলেন না।	খলিফার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জবাবদিহিতার বাইরে থাকত।

উমাইয়া যুগে খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরটি ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতির এক অনিবার্য রাজনৈতিক পরিণতি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসটি এই রূপান্তরের ঐতিহাসিক সত্যতাকে সত্যায়িত করে। অন্যদিকে, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিশ্লেষণ আমাদের দেখায় যে, শাসনপদ্ধতি রাজতান্ত্রিক হলেও যদি তা শরিয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্য (*মাকাসিদ আল-শরিয়াহ*) রক্ষা করে, তবে রাষ্ট্র তার ইসলামি সত্তা হারায় না। উমাইয়ারা এই রাজতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমেই একটি শক্তিশালী, সুসংহত ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল, যা পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বকে একটি পরাশক্তিতে পরিণত করতে সাহায্য করে। [17,18]

আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০–১২৫৮ খ্রি.) কেবল একটি রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ছিল না, বরং এটি ছিল ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ (Islamic Golden Age)। এই ঐতিহাসিক যুগে বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা ও সাহিত্যের মতো মৌলিক শাখাগুলোতে অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়, যা তৎকালীন বিশ্বকে এক নতুন চিন্তার খোরাক জোগায়। বিশেষ করে খলিফাদের প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে ‘বায়তুল হিকমাহ’ (House of Wisdom) প্রতিষ্ঠা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অনন্য ও যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক অনুবাদ আন্দোলন ও গবেষণার মূল কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মুসলিম সভ্যতাকে মধ্যযুগীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তির শীর্ষে নিয়ে যায়।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এই সময়েই গণিতে শূন্যের ব্যবহার জনপ্রিয় হয় এবং আল-খোয়ারিজমি বীজগণিত (Algebra) আবিষ্কার করেন, যা আধুনিক কম্পিউটারের মূল ভিত্তি। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবনে সিনা 'আল-কানুন ফিত-তিব' গ্রন্থ লিখে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রধান পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হতো। কাগজের সহজলভ্যতা এবং রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরিগুলোর প্রসারের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়ার সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'আরব্য রজনী' (Alif Laila)-র মতো কালজয়ী সৃষ্টি এই যুগেই সংকলিত হয়। বাগদাদ তখন কেবল রাজনীতির কেন্দ্র ছিল না, বরং এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেলা।

তবে এই দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান ঘটে অত্যন্ত মর্মান্তিক পন্থায়; ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল সেনাপতি হালাকু খানের নেতৃত্বাধীন বর্বর বাহিনীর আকস্মিক ও নৃশংস আক্রমণে বাগদাদের পতন ঘটে। এই বিধ্বংসী ঘটনার মাধ্যমে কেবল একটি সুসংগঠিত খিলাফতেরই চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেনি, বরং মধ্যযুগীয় ইসলামি জ্ঞানচর্চার মূল সৌধটিও চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মোঙ্গলরা লাইব্রেরিগুলোর লাখ লাখ বই দজলা নদীতে ফেলে দিয়েছিল, যার কালিতে নদীর পানি দীর্ঘদিনের জন্য কালো হয়ে গিয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। [19,20]

৩.৭ উসমানীয় খিলাফত ও তার অবসান

উসমানীয় সাম্রাজ্য (১২৯৯–১৯২৪ খ্রি.) ছিল ইসলামের ইতিহাসের দীর্ঘতম এবং শেষ মহান বৈশ্বিক খিলাফত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আনাতোলিয়ায় একটি ছোট উপজাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে এর যাত্রা শুরু হলেও, ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (দ্বিতীয় মুহাম্মদ) কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে এটি একটি বিশাল আন্তঃমহাদেশীয় সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান প্রথম সেলিম মামলুকদের পরাজিত করে মিশর জয় করেন এবং কায়রোতে অবস্থানরত শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের পবিত্র প্রতীকসমূহ (তলোয়ার ও চাদর) গ্রহণ করেন। এই ঐতিহাসিক স্থানান্তরের পর থেকে উসমানীয় সুলতানগণ একই সাথে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রধান এবং সমগ্র মুসলিম

উম্মাহর আধ্যাত্মিক নেতা বা খলিফার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। উসমানীয় খিলাফত কেবল সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করেনি, বরং এটি ছিল ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মিলনস্থলে অবস্থিত একটি শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক, আইনি ও সাংস্কৃতিক শাসনব্যবস্থা।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, উসমানীয় খিলাফত প্রায় চারশ বছর ধরে মক্কা, মদিনা ও জেরুজালেমের মতো পবিত্র স্থানগুলোর অভিভাবক হিসেবে মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা ও ঐক্যের প্রতীক ছিল। এই সাম্রাজ্যেই প্রথম সুসংগঠিত 'কানুন্নামা' বা ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসনিক আইনের সাথে শরিয়াহর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসী নীতির কারণে সাম্রাজ্যটি সংকুচিত হতে থাকে, যা ইতিহাসে 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' (Sick Man of Europe) নামে পরিচিতি পায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪–১৯১৮ খ্রি.) অক্ষশক্তির পক্ষে অংশগ্রহণ করে উসমানীয়দের পরাজয় খিলাফতের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। যুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রবাহিনী পুরো সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলে তুরস্কের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ে।

এই চরম ক্রান্তিকালে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কে একটি তীব্র জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। কামালের দূরদর্শী সামরিক নেতৃত্বে তুরস্ক বিদেশী দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত হলেও, তিনি রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও ইউরোপীয় ধাঁচের প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করার নীতি গ্রহণ করেন। এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে, ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ তুরস্কের গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে আইন পাসের মাধ্যমে উসমানীয় খিলাফত আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং শেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মজিদসহ রাজপরিবারের সকলকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। খিলাফতের এই আকস্মিক পতন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক গভীর মানসিক ধাক্কা, শোক এবং নজিরবিহীন রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। এই শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে এবং ইসলামি ঐক্য ফিরিয়ে আনার তাগিদে ভারতীয় উপমহাদেশে 'খিলাফত আন্দোলন' সহ বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ইসলামি পুনরুজ্জীবনের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের জন্ম হয়। [21,22]

অধ্যায় চার

ইসলামি শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতিসমূহ

ইসলামি শাসনব্যবস্থা মূলত নৈতিক মূল্যবোধ এবং সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রধান লক্ষ্য হলো মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ (মাসলাহাহ) নিশ্চিত করা এবং শরিয়তের উচ্চতর উদ্দেশ্যসমূহ (মাকাসিদ আশ-শরিয়াহ) বাস্তবায়ন করা। সমকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র এবং ইসলামি দর্শনের আলোকে এই শাসনব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ নিচে সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:

৪.১ তাওহীদ এবং আল্লাহর চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব

ইসলামি রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি হলো মহাবিশ্বের একক, অখণ্ড ও চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহর। প্রচলিত পশ্চিমা রাষ্ট্রদর্শনের মতো এখানে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত বা অবাধ ক্ষমতা জনগণ বা সংসদের হাতে ন্যস্ত নয়। মানবীয় আইনসভার পরিধি কেবল ঐশী আইনের (ঐশ্বরিক নীতিমালার) সীমানার মধ্যে সমসাময়িক প্রশাসনিক নিয়ম ও উপ-আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

“নিশ্চয়ই বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই।”

(সূরা ইউসুফ, ১২:৪০)।

আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল-মুবারক (২০২১) এর মতে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং এটি রাষ্ট্রকে যেকোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বৈরাচারী আইন চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখে এবং আইনের শাসন (Rule of Law) নিশ্চিত করে।

৪.২ খিলাফত ও আমানতদারী: জবাবদিহিতামূলক প্রতিনিধিত্ব

ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক কোনো ঐশ্বরিক বা প্রশ্নাতীত ক্ষমতার অধিকারী নন, বরং তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান এবং জনগণের অধিকার সুরক্ষার জন্য একজন নিয়োজিত প্রতিনিধি (Vicegerent)। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ইসলামে একটি পবিত্র 'আমানত' (Trust) হিসেবে গণ্য করা হয়, যার জন্য শাসককে পরকালে আল্লাহর দরবারে এবং ইহকালে জনগণের মজলিশে জবাবদিহি করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে ফিরিয়ে দাও।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

“তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল/দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৫৫৪)।

অধ্যাপক লুইস (২০১৬) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, খিলাফত ব্যবস্থা মূলত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি (Bay'ah), যা শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক অধিকার ও আইনি বাধ্যবাধকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

৪.৩ মজলিশ-উশ-শূরা: প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শ ব্যবস্থা

ইসলামি প্রশাসনে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। রাষ্ট্রের যেকোনো নীতি নির্ধারণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পারস্পরিক পরামর্শের (Shura) ভিত্তিতে নেওয়া বাধ্যতামূলক। এটি আধুনিক যুগে আইনসভা বা সংসদীয় ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক রূপ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“এবং তাদের প্রতিটি বিষয় সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।”

(সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩৮)।

গবেষক কামালী (২০১৮) উল্লেখ করেছেন যে, 'শূরা' নীতিটি সমাজকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করে যৌথ প্রজ্ঞা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) শাসনব্যবস্থার বিকাশ ঘটায়।

৪.৪ আল-‘আদালাহ: নিরপেক্ষ ও পরম ন্যায়বিচার

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান ও নিরপেক্ষ ইনসাফ নিশ্চিত করা ইসলামি প্রশাসনের বাধ্যতামূলক কর্তব্য। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'আল-আদল' বলা হয়, যা শাসকের নিজস্ব স্বার্থ বা স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে থেকে বাস্তবায়িত হতে হবে।

- **কুরআনিক ও হাদিসভিত্তিক প্রমাণ**: পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ...وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো... তা যদি তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেও যায়।"

(সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৫)।

- **একাডেমিক বিশ্লেষণ**: চ্যাপরা (২০১৪) তাঁর সামষ্টিক উন্নয়ন তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক ও আইনি ন্যায়বিচার ছাড়া কোনো সমাজ টেকসই হতে পারে না এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তিই হলো এই পরম সামাজিক ও আইনি সাম্য।

৪.৫ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা এবং নাগরিক সমতা

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় আইনের চোখে রাজা ও প্রজা, মুসলিম ও অমুসলিম (জিম্মি) সকলেই সমান। রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক অধিকার তথা—জীবন (Nafs), সম্পদ (Mal), বংশমর্যাদা (Nasl), বুদ্ধি বা বিবেক (Aql) এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা (Din) রক্ষা করতে আইনগতভাবে বাধ্য, যাকে শরিয়তের উচ্চতর লক্ষ্য (Maqasid) বলা হয়।

- **কুরআনিক ও হাদিসভিত্তিক প্রমাণ**: রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন,

"হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান একে অপরের জন্য পবিত্র ও হারাম করা হলো।"

(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১২১৮)।

- **একাডেমিক বিশ্লেষণ**: আন-নাঈম (২০১৯) এর মতে, মদিনা সনদের (Constitution of Medina) মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.) বহু-ধর্মীয় সমাজে যে বহুত্ববাদ (Pluralism) এবং নাগরিক অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আধুনিক মানবাধিকার সনদের আদি এবং শ্রেষ্ঠ রূপ।

৪.৬ হিসবাহ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র

ইসলামি রাষ্ট্র কেবল একটি শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা কর আদায়কারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি একটি সক্রিয় জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State)। সমাজ থেকে অন্যায়, দুর্নীতি ও কালোবাজারি দূর করা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে যাকাত ও ওশরের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মূল কাজ।

- **কুরআনিক ও হাদিসভিত্তিক প্রমাণ:** আল্লাহ তাআলা বলেন,

  الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

  “তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।”

  (সূরা আল-হজ্জ, ২২:৪১)।

- **একাডেমিক বিশ্লেষণ:** সিদ্দিকী (২০১৫) তাঁর অর্থনৈতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ইসলামি রাষ্ট্রে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা) পূরণ করা কোনো দয়া নয়, বরং এটি নাগরিকের আইনি অধিকার।

অধ্যায় পাঁচ
ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক ও নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব

৫.১ ভূমিকা

ইসলাম কেবল ঐতিহ্যগত কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবিধান (Complete Code of Life) এবং একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক-আইনি দর্শনের উৎস। ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর পরম সার্বভৌমত্ব (Absolute Sovereignty) এবং মানবজাতির সমষ্টিগত প্রতিনিধিত্ব বা খিলাফত (Vicegerency)। সমকালীন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ককে মূলত টমাস হবস, জন লক বা জঁ-জাক রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract Theory)-এর আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়, যা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং বস্তুগত স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই সম্পর্কটি একটি যুগপৎ নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং আইনি চুক্তির (Covenant) রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে শাসক বা শাসিত কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন; বরং উভয় পক্ষই ঐশ্বরিক বিধান (শরিয়াহ) এবং সর্বসাধারণের কল্যাণ (Maslahah al-Aammah) সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে সুশাসনের সংকট, মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং সংখ্যালঘু নিপীড়নের এই সন্ধিক্ষণে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রদর্শন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিকল্প মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে।

৫.২ ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি

একটি ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামো প্রধানত চারটি মৌলিক দার্শনিক স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

- **ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্ব (Hakimiyyah):** ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় নীতি হলো—মহাবিশ্বের চূড়ান্ত আইনগত ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষের তৈরি যেকোনো আইন বা নীতিকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে (আল-কুরআন, ৫:৪৪)।
- **সমষ্টিগত খিলাফত (Khilafah):** মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তার নির্দেশিত সীমানার মধ্যে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এই ক্ষমতা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা রাজতান্ত্রিক পরিবারের একচেটিয়া অধিকার নয়, বরং এটি সমগ্র জনগণের একটি পবিত্র আমানত (আল-কুরআন, ২৪:৫৫)।
- **পরম ন্যায়বিচার (Adlah):** জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ব্যতিরেকে সমাজের সর্বস্তরে পরম সামাজিক ও আইনি ইনসাফ কায়েম করাই ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানতম লক্ষ্য (আল-কুরআন, ৪:৫৮)।

- **শূরা বা পরামর্শভিত্তিক শাসন (Shuratic Democracy):** একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ইসলাম কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। রাষ্ট্রীয় সকল নীতিনির্ধারণী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও জনগণের সাথে পারস্পরিক পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক (আল-কুরআন, ৪২:৩৮)।

৫.৩ শাসকের যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলি

ক্লাসিক্যাল ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পথিকৃৎ ইমাম আল-মাওয়ার্দি (৯৭৪–১০৫৮ খ্রি.) এবং সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) তাদের তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহে একজন সফল রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও চারিত্রিক মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন:

- **তাকওয়া ও নৈতিক অখণ্ডতা (Ethical Integrity):** শাসককে তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সর্বোচ্চ খোদাভীতি ও চারিত্রিক স্খলনমুক্ত হতে হবে।
- **আইনি প্রজ্ঞা ও ইজতিহাদ (Legal Competence):** রাষ্ট্রীয় জটিল আইনি শূন্যতা পূরণে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধানে শাসকের গভীর শরিয়তি জ্ঞান এবং স্বাধীন গবেষণামূলক বিশ্লেষণ (Ijtihad) করার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।
- **শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা (Executive Competence):** রাষ্ট্রের কঠিন প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্বাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপ ও সংকট মোকাবেলার জন্য শাসকের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা অপরিহার্য।
- **সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা (Strategic Wisdom):** অভ্যন্তরীণ ফিতনা-বিশৃঙ্খলা দমন এবং বহিঃশত্রুর ভূ-রাজনৈতিক আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শাসককে সাহসী কৌশলবিদ হতে হবে।
- **জন-অভিগম্যতা (Accessibility):** শাসক সাধারণ প্রজা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখবেন না। খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর প্রশাসনিক নীতি ছিল জনগণের জন্য শাসকের দুয়ার সর্বদা উন্মুক্ত রাখা, যাতে প্রত্যেকে সরাসরি তার কাছে নিজের অধিকার দাবি করতে পারে (ইবনে সাদ, ১৯০৪)।

৫.৪ শাসকের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় খলিফা বা শাসক পরম ক্ষমতার অধিকারী নন, বরং তিনি আল্লাহর আইনের অধীন একজন আমানতদার মাত্র। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইমাম আল-মাওয়ার্দী তাঁর *'আল-আহকাম আস-সুলতানিয়াহ'* গ্রন্থে শাসকের প্রধান দায়িত্বগুলোকে সুনির্দিষ্ট করেছেন [23]

ক. শরিয়াহ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

শাসকের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজে আল্লাহ্‌র আইন বা শরিয়াহর বাস্তবায়ন এবং পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। এর লক্ষ্য কেবল ধর্মীয় আচার রক্ষা নয়, বরং নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্বকারী অপরাধ দমনে ইসলামি দণ্ডবিধি (Hudud) নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে ফিরিয়ে দিতে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"

(সূরা আন-নিসা: ৫৮)

খ. স্বাধীন বিচার বিভাগ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

ইসলামি রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কার্যনির্বাহী শাখা থেকে পৃথক। খলিফা আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর শাসননামায় দেখা যায়, একজন সাধারণ অমুসলিম নাগরিকের বিরুদ্ধে বর্ম চুরির মামলায় উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কাজী শুরাইহ স্বয়ং খলিফার বিপক্ষে রায় দেন (ইবনে কাছির, ১৯৮৮)। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে ইসলামি আইনি কাঠামোতে শাসক ও সাধারণ নাগরিক সম্পূর্ণ সমান আইনি মর্যাদার অধিকারী।

গ. জনকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা:

নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা শাসকের মৌলিক দায়িত্ব। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.)-এর ঐতিহাসিক উক্তি এই দায়িত্ববোধের চরম বহিঃপ্রকাশ:

"***ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে তার জন্যও ওমরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে***" [24]।

ঘ. পরামর্শভিত্তিক শাসন (Shura/Consultation): খলিফা এককভাবে কোনো স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে 'মজলিস-উশ-শূরা' বা বিশেষজ্ঞ পরিষদের সাথে পরামর্শ করতে হয়।

কুরআনে বলা হয়েছে:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"...এবং তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়"

(সূরা আশ-শূরা: ৩৮)।

৫.৫ শাসকের আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার

রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা এবং আইন-শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে খলিফা নাগরিকদের কাছ থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার লাভ করেন:

- **আনুগত্য পাওয়ার অধিকার (Right to Obedience):** যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক শরিয়াহর বিধান মেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আদেশ ও আইন মেনে চলা নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

  "শোনা এবং আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহর নাফরমানির (পাপের) আদেশ দেওয়া হয়"

  (সহীহ বুখারী: ৭১৪৪) [25]।

- **রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা (Financial Remuneration):** খলিফা নিজের এবং পরিবারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মধ্যম মানের ভাতা পাওয়ার অধিকারী, যাতে তিনি পূর্ণ সময় রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত রাখতে পারেন। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর ভাতা মজলিস-উশ-শূরা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছিল [26]।

- **সমষ্টিগত সহযোগিতা (Right to Public Cooperation):** কর বা রাজস্ব প্রদান, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার শাসকের রয়েছে।

- **গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ লাভ (Right to Constructive Counsel):** খলিফা আবু বকর (রা.) তার প্রথম ভাষণে বলেছিলেন,

  "আমি সঠিক পথে চললে আমাকে সাহায্য করো, আর ভুল করলে সোজা করে দাও"

  (আল-তাবারী, ১৯৮৭)।

শাসককে সঠিক পরামর্শ (Nasiha) দেওয়া নাগরিকের যেমন কর্তব্য, তেমনি এটি শাসকের একটি অধিকার।

৫.৬ নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার

ইসলামি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নাগরিকত্ব কোনো অলংকারিক বিষয় নয়, এটি একটি অলঙ্ঘনীয় মানবিক অধিকারের সনদ।

নাগরিকের অলঙ্ঘনীয় মৌলিক অধিকার		
জীবনের নিরাপত্তা	সম্পদের মালিকানা	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
নরহত্যা বা আঘাত থেকে পূর্ণ সুরক্ষা (আল-কুরআন ৫:৩২)	বিনা কারণে রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা সম্পূর্ণ অবৈধ	বিনা পরোয়ানায় বা অভিযোগ ছাড়া কোনো গ্রেপ্তার নয়

জীবনের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা:

মানবজীবনের মূল্য ইসলামে পরম। আল-কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী, ***অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল*** (৫:৩২)।

- **ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার (Right to Property):** নাগরিকদের বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের ওপর একচ্ছত্র মালিকানার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র কোনো জরুরি আইনি ও জনস্বার্থমূলক কারণ ছাড়া কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে না (আল-বুখারী, হাদিস নং: ১৭৩৯)।
- **ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও স্বাধীনতা (Right to Privacy and Liberty):** ইসলামি রাষ্ট্রে বিনা অপরাধে বা আদালতের পরোয়ানা ছাড়া কাউকে বন্দি বা নজরদারি করা সম্পূর্ণ বেআইনি। ইমাম আবু ইউসুফ (৭৯৮ খ্রি.) তার 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া যেকোনো ধরনের আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।
- **বাক-স্বাধীনতা ও ভিন্নমতের অধিকার (Freedom of Expression):** অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ইসলামে নাগরিকের অন্যতম অধিকার ও দায়িত্ব। খলিফা ওমরের (রা.) খুতবা চলাকালীন এক সাধারণ নারী মোহরানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করলে, খলিফা নিজের সিদ্ধান্ত

প্রত্যাহার করে বলেন, ***"ওমর ভুল করেছে এবং এই নারী সত্যকে উন্মোচন করেছে"*** (আল-আসকালানি, ১৩৭৯ হিজরি)।

৫.৭ নাগরিকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

অধিকার ভোগের বিপরীতে নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি কিছু সুনির্দিষ্ট আইনি ও নৈতিক কর্তব্য পালন করতে হয়:

- **সাংবিধানিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ:** রাষ্ট্রে নৈরাজ্য, সহিংসতা বা ফিতনা সৃষ্টি করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নিয়মতান্ত্রিক ও বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ (Baghy) একটি গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ।
- **আর্থিক অবদান ও কর ব্যবস্থা:** সম্পদশালী মুসলিম নাগরিকরা তাদের সঞ্চিত সম্পদের ওপর 'যাকাত' এবং কৃষি উৎপাদনের ওপর 'উশর' রাষ্ট্রীয় তহবিলে প্রদান করতে বাধ্য, যা সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরিতে ব্যবহৃত হয় (আল-কুরআন, ৯:৬০)।
- **জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা:** রাষ্ট্র যখন বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার্থে সামরিক বা বেসামরিক উপায়ে অংশগ্রহণ করা নাগরিকদের যৌথ দায়িত্ব (Fard al-Kifayah)।

৫.৮ ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা

আধুনিক বহুত্ববাদী (Pluralistic) বিশ্বব্যবস্থায় একটি রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার ওপর। ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার কোনো সাময়িক রাজনৈতিক সমঝোতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠের দয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং এটি শরিয়াহর চিরন্তন বিধান এবং একটি পবিত্র রাষ্ট্রীয় চুক্তির দ্বারা সুরক্ষিত। ইসলামি আইনের পরিভাষায় এই সুরক্ষিত অমুসলিম নাগরিকদের ‘জিম্মি’ (Dhimmi - যার জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে) বলা হয় [27]।

ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে অমুসলিমদের অধিকার		
মৌলিক নিরাপত্তা	ধর্মীয় ও আইনি স্বাধীনতা	সামাজিক ও অর্থনৈতিক হক
➢ জান ও মালের রক্ষা ➢ ইবাদতখানার সুরক্ষা	➢ নিজস্ব পারিবারিক আইন ➢ ধর্মীয় আচার পালনের হক	➢ জিজিয়ার বিনিময়ে সেবা ➢ অক্ষমদের রাষ্ট্রীয় ভাতা

১. জান, মাল ও ইবাদতখানার নিরাপত্তা

ইসলামি রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম নাগরিকের জীবন ও সম্পদের মূল্য একজন মুসলিমের সমান।

- **আইনের শাসন:** মদিনা সনদের (Constitution of Medina) মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম ও অমুসলিমদের সমান নাগরিক অধিকার ঘোষণা করেছিলেন [28]।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন:

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের (মুয়াহিদ) ওপর জুলুম করবে বা তার অধিকার খর্ব করবে... কেয়ামতের দিন আমি নিজে তার বিরুদ্ধে বাদী হব।"

(সুনান আবু দাউদ: ৩০৫২) [29]

- **ধর্মীয় উপাসনালয় রক্ষা:** যুদ্ধ বা শান্তি—যেকোনো পরিস্থিতিতে অমুসলিমদের গির্জা, সিনাগগ বা উপাসনালয় ধ্বংস করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) তাঁর সামরিক বাহিনীকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন,

  "তোমরা কোনো সন্ন্যাসীকে কষ্ট দেবে না এবং তাদের উপাসনালয় ভেঙে ফেলবে না" [30]।

২. ধর্মীয় ও বিচারিক স্বায়ত্তশাসন

আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রে সবার ওপর একটি অভিন্ন দেওয়ানি আইন (Uniform Civil Code) চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা অনেক সময় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রনীতি অমুসলিমদের বিচারিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে।

- **নিজস্ব পারিবারিক আইন:** বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। খিলাফতের আদালত তাদের ওপর শরিয়াহর এই ব্যক্তিগত আইন চাপিয়ে দেয় না [31]।
- **সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা:** মুসলিমদের জন্য যা নিষিদ্ধ (যেমন: শুকরের মাংস বা মদ), অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব সামাজিক গণ্ডির মধ্যে তা ব্যবহার বা ব্যবসা করতে পারে; রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করে না।

৩. 'জিজিয়া' করের বাস্তব রূপ ও সামরিক অব্যাহতি

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ওপর আরোপিত ‘জিজিয়া’ (Jizyah) কর নিয়ে আধুনিক রাজনীতিতে অনেক ভুল ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি কোনো শাস্তিমূলক কর নয়; এটি একটি নিরাপত্তা কর।

- **সামরিক অব্যাহতি:** ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান এবং দেশের প্রতিরক্ষায় অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু অমুসলিমদের এই ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এই সামরিক প্রতিরক্ষার বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রকে একটি সামান্য বাৎসরিক কর (জিজিয়া) প্রদান করে [32]।
- **কর মওকুফ ও রাষ্ট্রীয় ভাতা:** কোনো অমুসলিম যদি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে রাজি হয়, তবে তার জিজিয়া মওকুফ হয়ে যায়। তদুপরি, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, অন্ধ এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র অমুসলিমদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) একজন বৃদ্ধ ইহুদিকে ভিক্ষা করতে দেখে তাঁর জিজিয়া মওকুফ করে দেন এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে তাঁর জন্য স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থা করেন [33]। খলিফা ওমরের (রা.) আমলে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) হিরার খ্রিষ্টানদের সাথে চুক্তিতে লিখেছিলেন: *"যদি আমরা তোমাদের রক্ষা করতে সমর্থ হই, তবেই জিজিয়া গ্রহণ করব; অন্যথায় তা ফেরত দেব।"* ইতিহাস সাক্ষী, রোমানদের আক্রমণের ভয়ে মুসলিম বাহিনী যখন হিমস শহর ত্যাগ করছিল, তখন তারা সংগৃহীত সমস্ত জিজিয়ার টাকা খ্রিষ্টানদের ফেরত দিয়েছিল (আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ)।

৪. সামাজিক ন্যায়বিচার: খিলাফতের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে অমুসলিমদের অধিকার রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে।

- **খলিফা ওমর ও জেরুজালেম চুক্তি:** ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম বিজয়ের পর খলিফা ওমর (রা.) সেখানকার খ্রিষ্টানদের যে নিরাপত্তা চুক্তি (Assurance of Umar) দিয়েছিলেন, তা বিশ্ব ইতিহাসের একটি অনন্য দলিল। তিনি খ্রিষ্টানদের চার্চের ভেতর নামাজ পড়তে অস্বীকৃতি জানান, যাতে পরবর্তীকালের মুসলিমরা সেটিকে মসজিদ বানানোর দাবি না করতে পারে [34]।
- **কাজী আদালতে সমানাধিকার:** মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের ছেলে একজন সাধারণ কিবতি (খ্রিষ্টান) নাগরিককে অন্যায়ভাবে চাবুক মারলে, সেই খ্রিষ্টান নাগরিক মদিনায় এসে খলিফা ওমরের কাছে বিচার চান। খলিফা ওমর খ্রিষ্টান নাগরিকের হাতে চাবুক দিয়ে গভর্নরের ছেলেকে সমপরিমাণ

আঘাত করার নির্দেশ দেন এবং ঐতিহাসিক উক্তি করেন, *"তোমরা কবে থেকে মানুষকে দাসে পরিণত করলে, অথচ তাদের মায়েরা তাদের স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছে?"* [35]।

৫.৯ ইসলামি রাষ্ট্রনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান

১. তাত্ত্বিক ভূমিকা

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি ও সমাজদর্শনে নারীর অবস্থান কেবল একটি জেন্ডারভিত্তিক বা সামাজিক বিষয় নয়; এটি মূলত একটি মৌলিক আইনি ও সাংবিধানিক অধিকারের সমতুল্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, এমনকি আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়গুলোতেও যেখানে নারীদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমিত, সেখানে ইসলাম সপ্তম শতকেই নারীকে একটি স্বাধীন আইনি সত্তা (Legal Personhood) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের মূল ভিত্তি হলো—সৃষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক (আল-কুরআন, ৪:১)। পাশ্চাত্যের কিছু প্রাচ্যবাদী (Orientalist) লেখক ইসলামি রাষ্ট্রে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে অবমূল্যায়ন করার চেষ্টা করলেও, ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইনশাস্ত্র (ফিকহ) এবং ঐতিহাসিক দলিলসমূহ প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ, জননিরাপত্তা এবং আইনি পরামর্শ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ছিল সুনির্দিষ্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক (নাসিফ, ১৯৯২)।

২. রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের সমতা

ইসলামি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। আল-কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা অনুযায়ী, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শুভ কাজের বিস্তার এবং অন্যায়ের প্রতিরোধে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহযোগী বা বন্ধু:

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু (ও সহযোগী)। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে..."

(আল-কুরআন, ৯:৭১)।

ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, এই আয়াতটি সরাসরি **'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'** (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)-এর সামষ্টিক দায়িত্ব অর্পণ করে, যা ইসলামি রাষ্ট্রের মূল রাজনৈতিক ভিত্তি (মওদুদী, ১৯৮০)। যেহেতু এই দায়িত্ব নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর সমানভাবে অর্পিত, সেহেতু রাষ্ট্রীয়

ও সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে কথা বলা এবং গঠনমূলক সমালোচনা করা নারীর একটি অন্যতম রাজনৈতিক কর্তব্য ও নাগরিক অধিকার হিসেবে গণ্য।

৩. নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া ও শূরা ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা

ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক স্তম্ভ হলো পরামর্শ সভা বা **'শূরা' (Shura)**। ঐতিহাসিক ও আইনি নথিপত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং খলিফাগণ রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটে নারীদের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

- **হুদায়বিয়ার চুক্তি ও উম্মে সালামাহ (রা.)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা:** ৬ষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন এক অভূতপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক সংকটের সৃষ্টি হয়, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তার উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর রাজনৈতিক ও কৌশলগত পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার পরেই রাষ্ট্রীয় সংকটের সমাধান ঘটে (আল-বুখারী, ২০০২)। এটি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী বিষয়ে নারীর পরামর্শ গ্রহণের সাংবিধানিক বৈধতা রয়েছে।
- **খলিফা ওমরের (রা.) শূরা ও সুলাইমান বিন আবি হাছমাহ-এর মাতা:** খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর শাসননামায় দেখা যায়, মদিনার বাজার প্রশাসন ও অর্থনৈতিক তদারকির (Al-Hisbah) মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী দায়িত্ব তিনি 'শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ' নামক একজন প্রজ্ঞাবান নারীর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন (ইবনে হাজার, ১৩৭৯ হিজরি)। এছাড়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও নারীদের ভিন্নমত ও আইনি ব্যাখ্যা খলিফাগণ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন, যা প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রীয় আইনি বিতর্ক ও নীতিনির্ধারণে নারীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত জোরালো ছিল।

৪. বায়'আত বা ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক চুক্তি

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাকে 'ভোটাধিকার' বা রাজনৈতিক সমর্থন প্রকাশের অধিকার বলা হয়, ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে তার প্রাচীন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হলো **'বায়'আত' (Bay'ah)**। বায়'আত হলো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ও শাসকের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য এবং সমর্থনের একটি দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক চুক্তি।

- আল-কুরআনে নারীদের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক বায়'আত গ্রহণের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (আল-কুরআন, ৬০:১২)।
- ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আকাবার দ্বিতীয় শপথের (Second Pledge of Al-Aqabah) মাধ্যমে মদিনায় যখন প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছিল, তখন মদিনার

প্রতিনিধি দলের মধ্যে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তারা পুরুষদের মতোই সমান রাজনৈতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন (ইবনে হিশাম, ১৯৫৫)। ফলে, ইসলামি রাষ্ট্রে সরকার গঠন ও রাজনৈতিক সমর্থনে নারীর অধিকার খোদ কুরআন দ্বারা স্বীকৃত।

৫. কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার

ইসলামি আন্তর্জাতিক আইন বা সিয়ার (Siyar)-এর একটি অন্যতম বৈপ্লবিক দিক হলো, একজন সাধারণ নারী নাগরিকও যদি রাষ্ট্রের শত্রুপক্ষ বা কোনো বিদেশি নাগরিককে রাজনৈতিক আশ্রয় (Aman/Asylum) প্রদান করেন, তবে রাষ্ট্র সেই চুক্তি বজায় রাখতে বাধ্য।

- মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো বোন উম্মেহানি (রা.) মক্কার একজন কাফিরকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করেন। যখন খলিফা আলী (রা.) তাকে হত্যা করতে চাইলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন:

  "হে উম্মেহানি, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে রাষ্ট্রীয় আশ্রয় প্রদান করলাম"

  (আল-বুখারী, হাদিস নং: ৩১৭)।

- ক্লাসিক্যাল ফিকহবিদ ইমাম আল-কাসানি (১১৮৯ খ্রি.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, একজন মুসলিম নারী কর্তৃক প্রদত্ত রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক আশ্রয় রাষ্ট্রের পুরুষ বা খলিফা কর্তৃক প্রদত্ত আশ্রয়ের মতোই আইনিভাবে সমান কার্যকর।

৬. বিচার বিভাগ ও উচ্চ প্রশাসনিক পদে নারীর

ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে নারীর বিচারক (Qadi) বা উচ্চ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে কিছু তাত্ত্বিক ইজতিহাদগত মতপার্থক্য রয়েছে:

- **ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মত:** হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, যেসব সামাজিক ও দেওয়ানি মামলায় (যেমন: আর্থিক লেনদেন, বিবাহ, সম্পত্তি) নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, সেসব দেওয়ানি মামলায় নারী বিচারক (Judge) হিসেবে রায় দেওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন (আল-কাসানি, ১১৮৯ খ্রি.)।
- **ইমাম ইবনে জারির আত-তাবারী ও ইবনে হাজম-এর মত:** প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবিদ ইমাম আত-তাবারী এবং জাহিরি মাযহাবের ইমাম ইবনে হাজম আল-আন্দালুসি (১০৬৪ খ্রি.) মনে করেন, নারী রাষ্ট্রের যেকোনো বিচারিক ও সাধারণ প্রশাসনিক পদে (Judicial and General

Administration) অধিষ্ঠিত হতে পারবেন, এতে শরিয়তের কোনো বাধা নেই (ইবনে হাজম, খণ্ড ৯)।

- তবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ তথা 'প্রধান খিলাফত' বা 'রাষ্ট্রপ্রধান' (Imamate/Head of State)-এর ক্ষেত্রে জুমহুর (অধিকাংশ) ফিকহবিদ মনে করেন, যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধানকে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব (Commander-in-Chief) এবং সর্বজনীন জুমার নামাজের ইমামতির মতো কিছু সুনির্দিষ্ট জেন্ডার-নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাই এই পদটি পুরুষের জন্য নির্ধারিত (আল-মাওয়ার্দি, ২০০৬)। তবে এর বাইরে সরকারের অন্যান্য সকল নীতি-নির্ধারণী, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক পদে নারীর দায়িত্ব পালনে কোনো আইনি বাধা নেই।

সারসংক্ষেপ হিসেবে বলা যায়, ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে নারীর অবস্থান কোনো প্রান্তিক বা গৌণ বিষয় নয়। ইসলাম নারীকে কেবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারই দেয়নি, বরং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ, রাজনৈতিক চুক্তি (বায়'আত), কূটনৈতিক আশ্রয় প্রদান এবং সামাজিক সুশাসন বজায় রাখার প্রক্রিয়ায় তাকে সক্রিয় অংশীদার করেছে। কুরআন ও সুন্নাহর মূল চেতনা এবং প্রাথমিক খিলাফতের ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামি রাষ্ট্রে নারী একজন স্বাধীন, অধিকার সচেতন এবং প্রভাবশালী নাগরিক হিসেবে তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের পূর্ণ আইনি ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের অধিকারী।

৫.১০ রাষ্ট্র ও জনগণের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি

ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক ও জনগণের সম্পর্ক কোনো ঔপনিবেশিক বা শোষক-শোষিতের সম্পর্ক নয়; এটি পারস্পরিক চুক্তি এবং শর্তসাপেক্ষ আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল।

- **সীমিত আনুগত্যের তত্ত্ব (Theory of Limited Obedience):** ইসলামে অন্ধ বা নিঃশর্ত আনুগত্যের কোনো স্থান নেই। শাসকের আনুগত্য কেবল ততক্ষণই বৈধ, যতক্ষণ তার নির্দেশাবলী ন্যায়সঙ্গত কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না"

(মুসলিম, হাদিস নং: ১৮৪০)।

- **যৌথ জবাবদিহিতা:** ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক জনগণের কাছে এবং শাসক ও জনগণ উভয়ই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এই ত্রিমুখী জবাবদিহিতার কারণে রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে এবং স্বৈরতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়।

সামগ্রিক পর্যালোচনার আলোকে বলা যায়, ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোটি অধিকার ও কর্তব্যের এক অভূতপূর্ব এবং সুষম ভারসাম্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে শাসক কোনো একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী অধিপতি নন, বরং তিনি আল্লাহর আইন ও জনকল্যাণ বাস্তবায়নের জন্য নিযুক্ত একজন ট্রাস্টি বা আমানতদার মাত্র। একইভাবে নাগরিকরাও কেবল রাষ্ট্রের করদাতা বা নিষ্ক্রিয় জনসংখ্যা নন, বরং তারা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী ও সংশোধন প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশীদার। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা মুসলিম ও অমুসলিম উভয় নাগরিকের মানবাধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার যে আইনি গ্যারান্টি প্রদান করেছে, তা আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক। সমকালীন বিশ্বে সুশাসন কায়েম এবং একটি বৈষম্যহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে ইসলামের এই রাষ্ট্রীয় দর্শন ও আইনি রূপরেখা একটি শাশ্বত পথনির্দেশক হতে পারে।

অধ্যায় ৬

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইসলামি খিলাফতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৬.১ ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীর ভূ-রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মভিত্তিক বা ঐতিহ্যগত শাসনকাঠামোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে পশ্চিমা ‘জাতিরাষ্ট্র’ (Nation-State) ও ‘গণতন্ত্র’ (Democracy)-এর বিপরীতে ‘ইসলামি খিলাফত’ (Islamic Khilafat)-এর ধারণাটি একটি বিকল্প ও আদর্শিক রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে বারবার আলোচিত হয়েছে [4, 7] এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হলো আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধানতম উপাদান—গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ইসলামি রাষ্ট্রনীতির একটি তুলনামূলক, কাঠামোগত ও দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা। একই সাথে সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ও আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় খিলাফতের প্রভাব এবং এর বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন করা।

৬.২ ক্ষমতার উৎস ও পরিচালনা পদ্ধতি: গণতন্ত্র বনাম খিলাফত

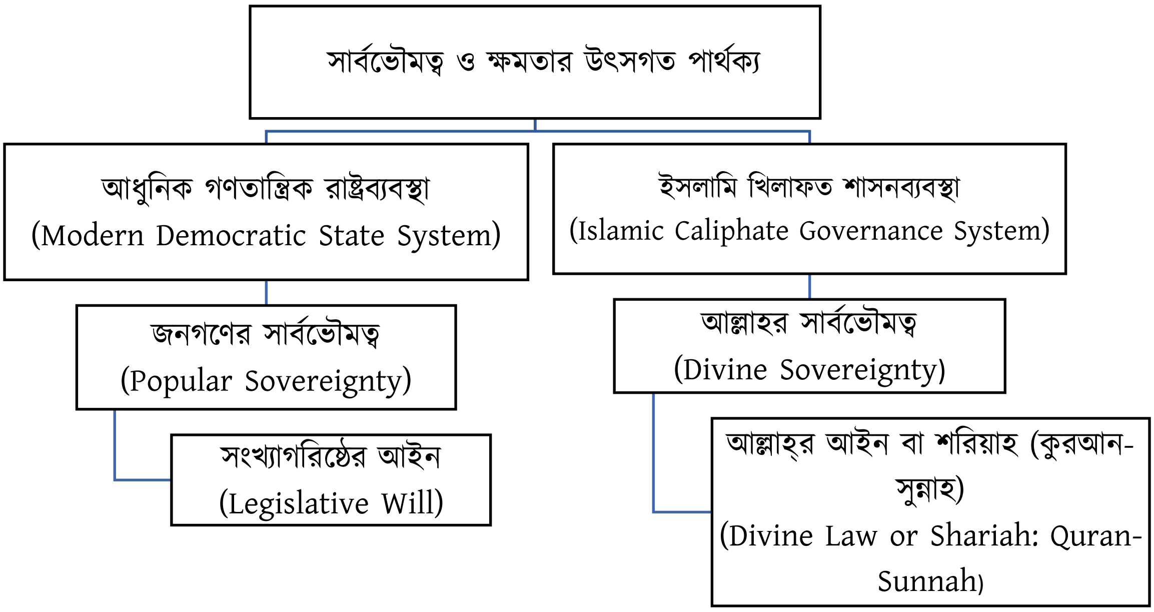
সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার উৎসগত পার্থক্য
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা
(Modern Democratic State System)
ইসলামি খিলাফত শাসনব্যবস্থা
(Islamic Caliphate Governance System)
জনগণের সার্বভৌমত্ব
(Popular Sovereignty)
আল্লাহর সার্বভৌমত্ব
(Divine Sovereignty)
সংখ্যাগরিষ্ঠের আইন
(Legislative Will)
আল্লাহ্র আইন বা শরিয়াহ (কুরআন-সুন্নাহ)
(Divine Law or Shariah: Quran-Sunnah)

৬.৩ সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) এবং আইনের উৎস

আধুনিক গণতন্ত্র এবং ইসলামি খিলাফতের মধ্যকার সবচেয়ে মৌলিক এবং দার্শনিক পার্থক্যটি নিহিত রয়েছে ‘সার্বভৌমত্ব’ (Sovereignty)-এর ধারণার মধ্যে।

- গণতান্ত্রিক দর্শন: ফরাসি দার্শনিক জঁ-জ্যাক রুশোর ‘সাধারণ ইচ্ছা’ (General Will) এবং জন লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে [9]। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে ‘জনগণ’-এর হাতে (Popular Sovereignty)। জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে যেকোনো আইন তৈরি, পরিবর্তন বা বাতিল হতে পারে—তা নৈতিক বা ঐতিহ্যগতভাবে যতই বিতর্কিত হোক না কেন।
- খিলাফতের দর্শন: ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব বা ‘হাকিমিয়াত’ একমাত্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর (Divine Sovereignty) [4]।

পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই।"

(সূরা ইউসুফ: ৪০)

খিলাফত ব্যবস্থায় মানুষ বা রাষ্ট্র কোনো মৌলিক আইনের স্রষ্টা নয়, বরং তারা ঐশ্বরিক আইন বা ‘শরিয়াহ’ (কুরআন ও সুন্নাহ)-এর অনুগত এবং বাস্তবায়নকারী মাত্র [3] খলিফা বা আইনসভা (মজলিস-উশ-শূরা) কেবল এমন বিষয়েই নতুন নিয়ম বা প্রশাসনিক আইন (ইজতিহাদ ও সিয়াসা শরিয়াহ) প্রণয়ন করতে পারে, যা শরিয়াহর মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৬.৪ নেতৃত্ব নির্বাচন, জবাবদিহিতা ও মেয়াদকাল

গণতন্ত্রে নেতৃত্ব ও জবাবদিহিতা:

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর (সাধারণত ৪ বা ৫ বছর) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে দলীয় ভিত্তিতে সরকার পরিবর্তিত হয়। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিযোগিতা

এবং ক্ষমতার ভারসাম্য (Checks and Balances) প্রধান চালিকাশক্তি। শাসক দল কেবল দেশের সংবিধান এবং তাদের ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

খিলাফতে নেতৃত্ব ও জবাবদিহিতা:

খিলাফত ব্যবস্থায় নেতৃত্ব নির্বাচনের পদ্ধতি বংশানুক্রমিক বা রাজতান্ত্রিক নয়, আবার আধুনিক পশ্চিমা দলীয় রাজনীতির মতোও নয়। এটি মূলত 'মজলিস-উশ-শূরা' (যোগ্য, চরিত্রবান, এবং ধর্মীয় ও সমসাময়িক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ সভা) এবং সাধারণ জনগণের 'বায়াত' (আনুগত্যের আনুষ্ঠানিক শপথ)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়, যার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন পদ্ধতি [৪] খিলাফতে শাসকের কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদকাল (Term Limit) থাকে না; খলিফা যতদিন শারীরিক-মানসিকভাবে যোগ্য থাকবেন এবং শরিয়াহর প্রতি অনুগত থাকবেন, ততদিন তিনি পদে বহাল থাকবেন। তবে খলিফা নিজের ইচ্ছামতো দেশ চালাতে পারেন না; তিনি একদিকে আল্লাহর কাছে এবং অন্যদিকে মজলিস-উশ-শূরা ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। শরিয়াহর স্পষ্ট লঙ্ঘন ঘটলে তাকে আইনি প্রক্রিয়ায় পদচ্যুত করার অধিকার শূরার রয়েছে।

৬.৫ ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ইসলামি রাষ্ট্রনীতি

১. রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ

ইউরোপের মধ্যযুগীয় চার্চের স্বৈরাচার এবং ধর্মীয় যুদ্ধের (যেমন: ত্রিশ বছরের যুদ্ধ) প্রতিক্রিয়া হিসেবে পশ্চিমা বিশ্বে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বা সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি ঘটে [10] ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল কথাই হলো—রাষ্ট্রীয় আইন, রাজনীতি, বিচার এবং প্রশাসন থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা। রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং ধর্ম হবে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয়।

এর বিপরীতে, ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম (দ্বীন) এবং রাষ্ট্র বা রাজনীতি (দুনিয়া) অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামে রাষ্ট্রকে কেবল একটি প্রশাসনিক যন্ত্র মনে করা হয় না, বরং একে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার একটি অনিবার্য মাধ্যম ধরা হয়। বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম আল-গাজালি তাঁর *'নাসিহাত আল-মুলুক'* গ্রন্থে লিখেছেন:

> ***"দ্বীন এবং রাষ্ট্র হলো জমজ ভাই। দ্বীন হলো একটি ভবনের ভিত্তি আর রাষ্ট্র হলো তার পাহারাদার। যার কোনো ভিত্তি নেই তা ভেঙে পড়ে, আর যার কোনো পাহারাদার নেই তা চুরি হয়ে যায়।"*** [2]

তাই ইসলামি রাষ্ট্রে রাজনীতি ও ধর্ম আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই; বরং রাষ্ট্রীয় প্রতিটি নীতি শরিয়াহর নৈতিক কাঠামোর অধীন।

২. নৈতিকতার উৎস ও নাগরিকত্ব

- **নৈতিকতার আপেক্ষিকতা:** ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাষ্ট্রে নৈতিকতার মানদণ্ড সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। যেমন, অতীতে পশ্চিমা বিশ্বে যা অনৈতিক বা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো (যেমন: সমকামিতা বা অবাধ গর্ভপাত), আধুনিক সেক্যুলার আইনসভায় তা বৈধতা পেয়েছে। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রে নৈতিকতার মানদণ্ড ‘ওহী’ বা ঐশ্বরিক বিধান দ্বারা নির্ধারিত হওয়ায় তা চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।
- **নাগরিকত্বের ভিত্তি:** আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় মূলত ভৌগোলিক সীমানা (Territoriality) এবং জাতীয়তাবাদের (Nationalism) ভিত্তিতে। অন্যদিকে, ঐতিহ্যগত ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকত্বের বিন্যাস ছিল দ্বি-স্তরবিশিষ্ট: ‘মুসলিম নাগরিক’ (যারা আদর্শিকভাবে রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত) এবং ‘অমুসলিম নাগরিক’ বা ‘জিম্মি’ (যারা একটি চুক্তির মাধ্যমে জান, মাল ও নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা লাভ করে) [3] তবে সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্রে সব ধর্মের মানুষকে সমান 'আইনি নাগরিক' (Constitutional Citizenship) হিসেবে গণ্য করার সুযোগ ইসলামি আইনের পরিধিতে রয়েছে।

৬.৬ আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় খিলাফতের প্রভাব

১. প্যান-ইসলামিজম এবং উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন

১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের হাত ধরে উসমানীয় (অটোমান) খিলাফতের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তির পর মুসলিম বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই পতনের ধাক্কা আধুনিক মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

- প্যান-ইসলামি চেতনা: খিলাফতের পতনের পূর্বেই জামালউদ্দীন আফগানি এবং মুহাম্মদ আবদুহ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বৈশ্বিক মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বা ‘প্যান-ইসলামিজম’ (Pan-Islamism)-এর যে

তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রধান জ্বালানি হিসেবে কাজ করে [7]

- উপমহাদেশের খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪): আলী ভাইদ্বয় (মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী) এবং মহাত্মা গান্ধীর সমর্থনে অবিভক্ত ভারতে যে খিলাফত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণের একটি অন্যতম মাইলফলক। এটি প্রমাণ করে যে খিলাফতের ধারণাটি কেবল ধর্মীয় ছিল না, বরং তা ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রতীক।

২. বিংশ শতাব্দীর ইসলামি পুনর্জাগরণবাদ

উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে পশ্চিমা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের বিকল্প হিসেবে খিলাফত বা ইসলামি রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক রূপরেখা প্রণয়নে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বড় ভূমিকা রাখেন সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদী (পাকিস্তান) এবং সাইয়্যিদ কুতুব (মিশর) [4, 5]

- **থিও-ডেমোক্রেসি (Theo-Democracy):** মওদুদী খিলাফতের ধারণাকে আধুনিক পরিভাষায় ‘থিও-ডেমোক্রেসি’ বা ‘খোদা-তান্ত্রিক গণতন্ত্র’ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি দেখান যে, এটি পশ্চিমা থিওক্রেসির (যাজকতন্ত্র) মতো নয়, কারণ ইসলামে কোনো পোপ বা যাজক শ্রেণী নেই। এটি এমন এক ব্যবস্থা যেখানে আল্লাহর দেওয়া সীমানার ভেতর থেকে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে [4]
- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব:** মিশরের ‘ইখওয়ানুল মুসলিমিন’ (Muslim Brotherhood) থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বহু ইসলামি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও চিন্তার মূলে খিলাফতের এই আদর্শিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। এমনকি অনেক মুসলিম দেশের আধুনিক সংবিধানে "আইনের প্রধান উৎস হবে শরিয়াহ" (যেমন: মিশরের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২) এই ধারাটি যুক্ত করার পেছনে খিলাফত আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক চাপ কাজ করেছে।

৬.৭ সমসাময়িক বিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা ও চ্যালেঞ্জ

১. সমসাময়িক সংকটে খিলাফতের তাত্ত্বিক সমাধান

বর্তমান বিশ্ব যখন নৈতিক অবক্ষয়, চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি, তখন ইসলামি রাষ্ট্রনীতির কিছু মূলনীতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিকল্প হিসেবে সামনে আসে:

ক) অর্থনৈতিক বিকল্প (সুদহীন ও কল্যাণমুখী অর্থনীতি)

আধুনিক পুঁজিবাদী (Capitalist) রাষ্ট্রব্যবস্থা সুদ, ফাটকাবাজি এবং অবাধ বাজারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানকে প্রতিনিয়ত আকাশচুম্বী করছে। এর বিপরীতে খিলাফতের অর্থনৈতিক মডেল দাঁড়িয়ে আছে ‘যাকাত’, ‘উশর’, ‘জিজিয়া’ এবং ‘বায়তুল মাল’ (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এর ওপর, যেখানে সুদের (Riba) কোনো স্থান নেই [4] পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা হলো:

"...যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"

(সূরা আল-হাশর: ৭)

২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দা এবং সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের পর পশ্চিমা মূলধারার বহু অর্থনীতিবিদও স্বীকার করেছেন যে, ইসলামি ব্যাংকিং ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর।

খ) নিরপেক্ষ বিচারিক ব্যবস্থা ও সুশাসন

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে বিচার বিভাগ প্রায়শই রাজনৈতিক প্রভাবাধীন বা দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হয়। কিন্তু খিলাফতের বিচার ব্যবস্থা (কাজী ব্যবস্থা) সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইসলামের ইতিহাসে খলিফা নিজেও সাধারণ নাগরিকের মতো আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হতেন। চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) এবং একজন সাধারণ অমুসলিম নাগরিকের বর্ম চুরির ঐতিহাসিক মামলার রায় খলিফার বিপক্ষে যাওয়া এর অন্যতম উদাহরণ [8] এই ধরনের কঠোর ও বৈষম্যহীন জবাবদিহিতা আধুনিক ‘সুশাসন’ (Good Governance) ও ‘আইনের শাসন’ (Rule of Law) নিশ্চিতকরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হতে পারে।

২. বাস্তবায়নের বাস্তবমুখী চ্যালেঞ্জসমূহ

তাত্ত্বিকভাবে খিলাফত ব্যবস্থা যতটাই আদর্শিক হোক না কেন, সমসাময়িক বাস্তব বিশ্বে তা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিল ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

1. জাতিরাষ্ট্রের একক আধিপত্য (The Nation-State Paradigm): বর্তমান বিশ্ব ১৬৪৮ সালের ‘ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি’ (Treaty of Westphalia) এবং জাতিসংঘের সনদের ওপর ভিত্তি করে সার্বভৌম ভৌগোলিক জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত। খিলাফতের মূল দর্শন হলো একটি একক বিশ্বজনীন মুসলিম উম্মাহ (Transnational Community)। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনি ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে একটি বৈশ্বিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সমকালীন ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় অত্যন্ত দূরূহ এবং সংঘাতপূর্ণ [7]
2. চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা ধারণার অপব্যবহার: একবিংশ শতাব্দীতে কিছু উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী (যেমন: আইএসআইএস বা দায়েশ) ‘খিলাফত’ শব্দটির অপব্যবহার করে জঘন্য সহিংসতা ও স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিল। এর ফলে আন্তর্জাতিক মহলে খিলাফতের মূল সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক ধারণার প্রতি এক ধরণের তীব্র ভীতি বা ‘ইসলামোফোবিয়া’ (Islamophobia) তৈরি হয়েছে, যা দূর করা একটি বড় বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ।
3. শূরা ব্যবস্থার আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ: প্রাচীন আমলে মদিনা রাষ্ট্রে বা খেলাফতে রাশেদার সময় জনসংখ্যা কম থাকায় সরাসরি বা সংক্ষিপ্ত পরামর্শের মাধ্যমে শূরা ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। কিন্তু বর্তমান কোটি কোটি জনসংখ্যার রাষ্ট্রে, জটিল বৈশ্বিক অর্থনীতি ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে কীভাবে ‘মজলিস-উশ-শূরা’ এবং ‘বায়াত’-এর প্রাতিষ্ঠানিক ও আধুনিক রূপ দেওয়া যাবে, তা নিয়ে সমসাময়িক ইসলামি স্কলারদের মধ্যে এখনো কোনো সর্বসম্মত ও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা (Modern Institutional Blueprint) চূড়ান্ত হয়নি।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ইসলামি খিলাফতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই দুটি ব্যবস্থা কেবল দুটি ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনদর্শনের বহিঃপ্রকাশ। পশ্চিমা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বা গণতন্ত্র মানুষকে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং বস্তুগত উন্নয়নের সর্বোচ্চ সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে মানুষকে দিশেহারা ও আপেক্ষিকতার গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়। অন্যদিকে, ইসলামি খিলাফত মানুষের ইহলৌকিক প্রগতির পাশাপাশি পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

খিলাফত কোনো স্বৈরতন্ত্র নয় এবং এটি পশ্চিমা অর্থে 'থিওক্রেসি' বা যাজকতন্ত্রও নয়। খলিফা কোনো অভ্রান্ত সত্ত্বা নন, তিনি জনগণের প্রতিনিধি এবং শরিয়াহর প্রধান খাদেম মাত্র। সমসাময়িক বিশ্বব্যবস্থায় হয়তো রাতারাতি একটি ভৌগোলিক সীমানাহীন বৈশ্বিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; তবে আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই খিলাফতের মূল চেতনা—যেমন পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত (শূরা), স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, সুদহীন কল্যাণমুখী অর্থনীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিগুলো গ্রহণ করে একটি আধুনিক 'ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র' (Islamic Welfare State) গড়ে তুলতে পারে। আর এটাই হতে পারে সমকালীন বিশ্বের সংকটগুলোর জন্য খিলাফতের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও আধুনিক প্রয়োগ।

৬.৮ সমসাময়িক কেস স্টাডি: ইসলামি রাষ্ট্রনীতির ভিন্নধর্মী প্রায়োগিক রূপ

বর্তমান বিশ্বে পূর্ণাঙ্গ খিলাফত ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকলেও, ইসলামি শাসনব্যবস্থা বা শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের দাবিদার তিনটি দেশের শাসনকাঠামো খিলাফতের মূল ধারণার সাথে আধুনিক রাষ্ট্রনীতির এক জটিল মিশ্রণ তৈরি করেছে। দেশ তিনটির শাসনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে ইসলামি রাষ্ট্রনীতির বৈচিত্র্যময় রূপটি স্পষ্ট হয়:

সমসাময়িক ইসলামি শাসনব্যবস্থার রূপভেদ		
দেশ	শাসন ব্যবস্থার ধরণ	ক্ষমতার মূল কেন্দ্র
১. ইরান	থিওক্রেটিক প্রজাতন্ত্র	ওয়ালি-ই ফকিহ (সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা)
২. সৌদি আরব	পরম রাজতন্ত্র	আল-সাউদ রাজপরিবার ও রাজা
৩. আফগানিস্তান	ইসলামি আমিরাত	আমিরুল মুমিনিন ও শূরা কাউন্সিল

১. ইরান: শিয়া রাজনৈতিক তত্ত্ব ও 'ওয়ালায়াত-ই ফকিহ' (Theocratic Republic)

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক মডেল প্রতিষ্ঠিত হয়, যা 'ওয়ালায়াত-ই ফকিহ' (Guardianship of the Islamic Jurist) নামে পরিচিত।

- **কাঠামো ও ক্ষমতার উৎস:** ইরানের শাসনব্যবস্থা থিওক্রেসি (ধর্মতন্ত্র) এবং আধুনিক প্রজাতন্ত্রের একটি মিশ্রণ। এখানে একটি নির্বাচিত সংসদ (Majlis) এবং প্রেসিডেন্ট থাকলেও, চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে একজন 'সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা' (Supreme Leader) বা ফকিহ-র হাতে।
- **খিলাফতের সাথে তুলনা:** শিয়া ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী, দ্বাদশ ইমামের অনুপস্থিতিতে একজন যোগ্যতম ইসলামি আইনবিদ (ফকিহ) রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব করবেন। এটি সুন্নি খিলাফত ব্যবস্থা থেকে পৃথক, কারণ খিলাফতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব মজলিস-উশ-শূরার পরামর্শে জনগণের বায়াতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্তরক্রম (Hierarchy) বা যাজকীয় আধিপত্যের ওপর নয়।

২. সৌদি আরব: সুন্নি ওয়াহাবি ঐতিহ্য ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy)

১৭৪৪ সালে মুহাম্মদ ইবনে সৌদ (রাজনৈতিক নেতা) এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের (ধর্মীয় সংস্কারক) মধ্যকার ঐতিহাসিক চুক্তির ওপর ভিত্তি করে আধুনিক সৌদি আরবের শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

- **কাঠামো ও ক্ষমতার উৎস:** সৌদি আরব একটি 'পরম রাজতন্ত্র' (Absolute Monarchy)। এখানে কোনো লিখিত সংবিধান নেই; পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহকে দেশের সর্বোচ্চ সংবিধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের রাজা একই সাথে সরকারের প্রধান এবং বিচারিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। আইন প্রণয়নে রাজকীয় ডিক্রি (Royal Decrees) প্রধান ভূমিকা পালন করে।
- **খিলাফতের সাথে তুলনা:** সৌদি আরব নিজেদের 'শরিয়াহ চালিত রাষ্ট্র' দাবি করলেও এর বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক কাঠামো খিলাফতের মূল দর্শনের পরিপন্থী। খিলাফতে নেতৃত্ব কোনো নির্দিষ্ট পরিবার বা বংশের একচেটিয়া অধিকার নয়, বরং তা যোগ্যতা এবং শূরার পরামর্শের ওপর নির্ভরশীল। তবে বাদশাহ ফাহাদের আমল থেকে 'খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন' (দুই পবিত্র মসজিদের সেবক) উপাধি গ্রহণ করে রাষ্ট্রটি বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক নেতৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে।

৩. আফগানিস্তান: তালেবানের 'ইসলামি আমিরাত' (Islamic Emirate)

২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে এবং পূর্বের গণতান্ত্রিক সংবিধান বাতিল করে 'ইসলামি আমিরাত' (Islamic Emirate) ঘোষণা করে।

- **কাঠামো ও ক্ষমতার উৎস:** আফগানিস্তানের বর্তমান শাসনব্যবস্থা চরম কেন্দ্রীভূত এবং সম্পূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক। এর মূল কেন্দ্র কান্দাহারে অবস্থিত 'আমিরুল মুমিনিন' (বর্তমানে হিদায়েতুল্লাহ আখুন্দজাদা) এবং তাঁর কট্টরপন্থী আলেমদের কাউন্সিল। এখানে কোনো পশ্চিমা ধাঁচের সংসদ বা নির্বাচন ব্যবস্থা নেই। হানাফি ফিকহ (Islamic Jurisprudence)-এর কঠোর ও ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে বিচার ও আইন পরিচালিত হয়।
- **খিলাফতের সাথে তুলনা:** তালেবান তাদের রাষ্ট্রপ্রধানকে 'আমিরুল মুমিনিন' (যা ঐতিহাসিকভাবে খলিফাদের উপাধি ছিল) হিসেবে সম্বোধন করলেও, এটি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার (আফগানিস্তান) মধ্যে সীমাবদ্ধ জাতিরাষ্ট্রের মতোই আচরণ করে। খিলাফতের সর্বজনীন উম্মাহ-ভিত্তিক ধারণার সাথে এর তফাত রয়েছে। এছাড়া, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের মতামত এবং জবাবদিহিতার যে উন্মুক্ত পরিবেশ ছিল, সমসাময়িক আফগান আমিরাতের কঠোর সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এই কেস স্টাডি থেকে শিক্ষণীয় (Analytical Insights)

এই তিনটি দেশের বাস্তব উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমসাময়িক বিশ্বে 'ইসলামি রাষ্ট্র' ধারণার কোনো একক বা অভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই। ইরান ইসলামি মূল্যবোধের সাথে প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (নির্বাচন ও সংসদ) যুক্ত করেছে, সৌদি আরব ঐতিহ্যগত রাজতন্ত্রকে শরিয়াহর সাথে মেলাবার চেষ্টা করেছে, এবং আফগানিস্তান আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সব উপাদানকে অস্বীকার করে একটি কট্টর ঐতিহ্যবাদী আলেম-তান্ত্রিক শাসন বেছে নিয়েছে।

এই বৈচিত্র্য প্রমাণ করে যে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় একটি সফল এবং ভারসাম্যপূর্ণ 'ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র' বা 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠা করতে হলে কেবল শরিয়াহর আইনি দিক প্রয়োগ করাই যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে খিলাফতের মূল প্রাণশক্তি—যেমন সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক সমতা এবং শাসক ও জনগণের মধ্যকার উন্মুক্ত পরামর্শভিত্তিক (শূরা) সম্পর্ক নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

অধ্যায় ৭

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ

৭.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হলো আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা (গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) এবং ইসলামি খিলাফতের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফলসমূহ উপস্থাপন এবং সেগুলোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণায় সংগৃহীত গুণগত (Qualitative) উপাত্ত, ঐতিহাসিক দলিল এবং সমসাময়িক কেস স্টাডি (ইরান, সৌদি আরব ও আফগানিস্তান) বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাষ্ট্র দুটির ক্ষমতার উৎস, শাসনপদ্ধতি, নাগরিক অধিকার, নারীর অবস্থান এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর তুলনামূলক চিত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণটি গবেষককে থিসিসের মূল হাইপোথিসিস বা অনুমিত সিদ্ধান্তসমূহ যাচাই করতে সাহায্য করবে।

৭.২ গবেষণার মূল ফলাফলসমূহ (Key Findings)

গবেষণার প্রধান ফলাফলসমূহ		
১. ক্ষমতার উৎস	২. সুশাসন ও বিচার	৩. বহুমাত্রিক সংকট
• গণতন্ত্রে জনমত সর্বোচ্চ আইনের ভিত্তি। • খিলাফতে শরিয়াহর চিরন্তন ফ্রেমওয়ার্ক।	• খিলাফতে স্বাধীন কাজী, আদালত ও খলিফার জবাবদিহি। • আধুনিক গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা	• মুসলিম বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক ও উপদলীয় বিভাজনই পুনর্গঠনের প্রধানতম প্রতিবন্ধকতা।

৭.৩ ক্ষমতার উৎস ও আইনি কাঠামোগত ভিন্নতা

গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক গণতন্ত্র এবং ইসলামি খিলাফতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈসাদৃশ্যটি ক্ষমতার উৎসগত দর্শনে।

- **ফলাফল এ:** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন তৈরি হয় মানবীয় প্রজ্ঞা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের (Popular Will) ওপর ভিত্তি করে [১]। এর ইতিবাচক দিক হলো এটি অত্যন্ত নমনীয় এবং যুগোপযোগী। তবে এর নেতিবাচক দিক হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোনো নৈতিক বা অনৈতিক আইন পাস করা সম্ভব।
- **ফলাফল বি:** খিলাফত ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা মানুষের নেই; বরং তা ঐশ্বরিক আইন বা শরিয়াহ (কুরআন ও সুন্নাহ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত [২]। এর ফলে আইনের নৈতিক মানদণ্ড চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় থাকে, যা সমাজের মৌলিক মূল্যবোধকে সুরক্ষিত রাখে।

২. সুশাসন, নিরপেক্ষ বিচার ও জবাবদিহিতা

ঐতিহাসিক তথ্য ও কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করে শাসকের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে একটি অনন্য ফলাফল পাওয়া গেছে।

- **ফলাফল:** আধুনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য (Checks and Balances) থাকলেও বিচার বিভাগ অনেক সময় রাজনৈতিক দল বা কর্পোরেট পুজিঁ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ খিলাফত ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ (কাজী আদালত) সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। খলিফা নিজে অপরাধ করলে সাধারণ নাগরিকের মতো আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হতেন [৩]। খিলাফতের এই "ত্রিমুখী জবাবদিহিতা" (আল্লাহর কাছে, শূরার কাছে এবং জনগণের কাছে) সুশাসন নিশ্চিত করতে আধুনিক সেক্যুলার জবাবদিহিতার চেয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী।

৩. অর্থনৈতিক সমতা ও সম্পদ বণ্টন

পুঁজিবাদ ও ইসলামি অর্থনীতির তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা গেছে:

- **ফলাফল:** আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সুদ ও অবাধ বাজারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা সমাজে তীব্র ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তৈরি করছে। অন্যদিকে, খিলাফতের যাকাত, উশর এবং সুদহীন (Riba-free) অর্থনৈতিক মডেল সম্পদকে সমাজের প্রতিটি স্তরে আবর্তিত করতে বাধ্য করে [৪]। ফলে এটি

সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া রোধ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) গঠনে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

৪. নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার

পশ্চিমা নেতিবাচক ধারণার বিপরীতে গবেষণার ফলাফল ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে নারী ও অমুসলিমদের অধিকারের ইতিবাচক দিক প্রমাণ করে।

- **ফলাফল (নারী):** প্রাথমিক খিলাফতে নারীদের স্বাধীন রাজনৈতিক মতামত (বায়াত), নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ (শূরা) এবং সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় (যেমন: খলিফা ওমরের বাজার প্রশাসক হিসেবে শিফা বিনতে আব্দুল্লাহর নিয়োগ) [৫]।
- **ফলাফল (অমুসলিম):** অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা, ধর্মীয় উপাসনালয়ের সুরক্ষা এবং নিজস্ব পারিবারিক আইন অনুযায়ী চলার বিচারিক স্বায়ত্তশাসন (Judicial Autonomy) খিলাফত রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে [৬]।

৭.৩ ক্ষমতার উৎস ও আইনি কাঠামোগত ভিন্নতা১. সমসাময়িক কেস স্টাডির বিশ্লেষণ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনটি সমসাময়িক দেশের কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সত্য উন্মোচিত হয়—**"বর্তমান বিশ্বে আদর্শিক খিলাফতের কোনো একক বা পূর্ণাঙ্গ মডেল বিদ্যমান নেই।"**

- **ইরানের মডেল:** ইরান ‘ওয়ালায়াত-ই ফকিহ’ তত্ত্বের মাধ্যমে ধর্মতন্ত্রের সাথে আধুনিক প্রজাতন্ত্রের (সংসদ ও নির্বাচন) মিশ্রণ ঘটিয়েছে। এটি শিয়া ধর্মতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা সামগ্রিক সুন্নি উম্মাহর খিলাফত ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে না।
- **সৌদি আরবের মডেল:** সৌদি আরব শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের দাবি করলেও এর ‘পরম রাজতন্ত্র’ (Absolute Monarchy) এবং বংশানুক্রমিক ক্ষমতা হস্তান্তর পদ্ধতি খিলাফতের মূল দর্শন—‘শূরা’ বা পরামর্শভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী [৭]।
- **আফগানিস্তানের মডেল:** তালেবানের ‘ইসলামি আমিরাত’ একটি কট্টর ঐতিহ্যবাদী আলেম-তান্ত্রিক শাসন। এটি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডকে

সম্পূর্ণ অস্বীকার করায় এটি বৈশ্বিক বিচ্ছিন্নতার শিকার এবং খিলাফতের উন্মুক্ত জবাবদিহিতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক।

বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্ত: এই তিনটি দেশের বিচ্যুতি প্রমাণ করে যে, কেবল শরিয়াহর আক্ষরিক বা দণ্ডবিধির প্রয়োগই একটি রাষ্ট্রকে 'ইসলামি খিলাফত' বানায় না; বরং খিলাফতের মূল প্রাণশক্তি—সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, এবং শাসক-জনতার উন্মুক্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

২. চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার আপেক্ষিক ভারসাম্য

- **চরমপন্থা ও ইসলামোফোবিয়ার প্রভাব:** উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইএসআইএস বা আল-কায়েদার মতো উগ্রপন্থী দলগুলোর দ্বারা 'খিলাফত' শব্দের অপব্যবহার আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় এই ধারণার সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক মহলে যে 'ইসলামোফোবিয়া' তৈরি হয়েছে, তা খিলাফতের রাজনৈতিক আলোচনাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে [৮]।
- **বিশ্বায়নের বৈরিতা:** বর্তমান ওয়েস্টফেলিয়ান জাতিরাষ্ট্রের কাঠামো (Nation-State Paradigm) এবং বিশ্বায়নের সেক্যুলার আইনি নেটওয়ার্ক একটি একক বিশ্বজনীন খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথকে অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ করে তুলেছে।

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, তাত্ত্বিকভাবে ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থা আধুনিক পুঁজিবাদী ও সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচারিক সংকটের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও টেকসই বিকল্প (Alternative Paradigm) হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক বিভাজন, বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা এবং উগ্রবাদের বিস্তার এই সম্ভাবনাকে চরম চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

গবেষণার চূড়ান্ত বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, সমসাময়িক বিশ্বে রাতারাতি একটি বৈশ্বিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা অবাস্তব। এর পরিবর্তে, মুসলিম দেশগুলো যদি তাদের বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই খিলাফতের মূল চেতনা—যেমন পরামর্শভিত্তিক সুশাসন (শূরা), স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ এবং যাকাতভিত্তিক সুদহীন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে, তবে তা একটি আধুনিক "ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র" (Islamic Welfare State) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, যা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য রূপরেখা।

অধ্যায় ৮

উপসংহার ও সুপারিশমালা

এই গবেষণায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধানতম স্তম্ভ—গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ইসলামি খিলাফত বা রাষ্ট্রনীতির একটি গভীর, তুলনামূলক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম দিকে ক্ষমতার উৎস, নেতৃত্ব নির্বাচন এবং আইনের শাসনের মতো কাঠামোগত বিষয়গুলোর বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করা হয়। পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষতার আপেক্ষিক নৈতিকতার বিপরীতে ইসলামি রাষ্ট্রনীতির চিরন্তন ও ওহী-ভিত্তিক মূল্যবোধের অবস্থান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৮.১ গবেষণালব্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

সমগ্র গবেষণার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হওয়া গেছে:

গবেষণালব্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত		
১. আদর্শিক বিকল্প	২. কাঠামোগত বিচ্যুতি	৩. কল্যাণ রাষ্ট্র মডেল
• আধুনিক পুঁজিবাদ ও সেক্যুলার সংকটে খিলাফত একটি টেকসই মডেল।	• সমসাময়িক কোনো দেশই এককভাবে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ খিলাফতের প্রতিনিধিত্ব করে না।	• বৈশ্বিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা আপাতত দূরূহ হলেও আঞ্চলিক 'ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র' গড়া সম্ভব।

1. **আদর্শিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব:** আধুনিক পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষকে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং বস্তুগত উন্নয়নের সুযোগ দিলেও, নৈতিক অবক্ষয়, চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বিচারিক দীর্ঘসূত্রিতা থেকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে [২, ৪]। এই ক্ষেত্রে ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থা তার সুদহীন কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক দর্শন, স্বাধীন কাজী আদালত এবং শাসকের কঠোর আত্ম-জবাবদিহিতার মাধ্যমে মানবজাতির জন্য একটি শক্তিশালী ও টেকসই সামাজিক-রাজনৈতিক বিকল্প (Alternative Paradigm) হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে [২, ৪]।

2. **থিওক্রেসি বা স্বৈরতন্ত্রের বিপরীত অবস্থান:** খিলাফত কোনো স্বৈরতন্ত্র বা রাজতন্ত্র নয়, আবার এটি পশ্চিমা অর্থে 'থিওক্রেসি' বা যাজকতন্ত্রও নয়; কারণ ইসলামে কোনো পোপ বা বিশেষ ধর্মযাজক শ্রেণী নেই যারা ঈশ্বরের নামে শাসন করে [৪]। খলিফা হলেন শরিয়াহর অধীন এবং জনগণের পরামর্শের (শূরা) ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী একজন আমানতদার মাত্র [৫]।
3. **বাস্তবসম্মত প্রয়োগের রূপরেখা:** বর্তমান ওয়েস্টফেলিয়ান জাতিরাষ্ট্রের কাঠামো (Nation-State Paradigm) এবং বিশ্বায়নের সেক্যুলার আন্তর্জাতিক আইনের আধিপত্যের কারণে রাতারাতি একটি ভৌগোলিক সীমানাহীন একক বৈশ্বিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সমকালীন ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় অত্যন্ত দুরূহ ও সংঘাতপূর্ণ [১, ৩]। তাই খিলাফতের মূল চেতনা—ন্যায়বিচার, শূরা বা পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত, সুদহীন অর্থনীতি এবং মানবাধিকার রক্ষার নীতিগুলো বর্তমান জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরেই প্রয়োগ করে একটি আধুনিক "ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র" (Islamic Welfare State) গড়ে তোলাই বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবমুখী সমাধান [৬]।

৮.২ সুপারিশমালা

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং সমসাময়িক বিশ্বের চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনা করে একটি কার্যকর, আধুনিক ও ন্যায়ভিত্তিক ইসলামি শাসনব্যবস্থার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করা হলো:

১. রাজনৈতিক ও কাঠামোগত সুপারিশ

- **শূরা ব্যবস্থার আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ:** প্রাচীন আমলের মজলিস-উশ-শূরাকে আধুনিক যুগের সংসদীয় বা বিশেষজ্ঞ পরিষদের সাথে সমন্বয় করতে হবে। শাসনব্যবস্থায় যেন কোনো একক একনায়কতন্ত্র তৈরি হতে না পারে, সেজন্য আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি' (Separation of Powers) এবং শক্তিশালী শাসনতান্ত্রিক আইনি কাঠামো (Constitutional Checks) খিলাফতের শূরার ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে [৫, ৬]।
- **পর্যায়ক্রমিক আঞ্চলিক ঐক্য ও ব্লক গঠন:** রাতারাতি একক বিশ্ব খিলাফত প্রতিষ্ঠার আবেগসর্বস্ব চেষ্টা পরিহার করে মুসলিম দেশগুলোর উচিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) আদলে প্রথমে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্লক গড়ে তোলা [৬]। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভিসা-মুক্ত যাতায়াত, অবাধ

বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Area) এবং একটি যৌথ প্রতিরক্ষা কাউন্সিল (যেমন ওআইসি-কে পুনর্গঠন করে) গঠনের মাধ্যমে খিলাফতের বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যেতে পারে।

২. অর্থনৈতিক সুপারিশ

- **যাকাত ও সুদহীন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় আধুনিকায়ন:** কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত আদায়ের পরিবর্তে একে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক রূপ দিতে হবে [৪]। এর পাশাপাশি আধুনিক ডিজিটাল অর্থনীতি, ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির যুগে সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংকিংয়ের পরিধি বাড়াতে হবে, যা পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষা করবে [৪]।

৩. বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক সুপারিশ

- **গতিশীল ইজতিহাদের পুনরুজ্জীবনে জোর দেওয়া:** মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ফিকহ হুবহু আধুনিক রাষ্ট্রে প্রয়োগ করার কট্টর মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে [২]। আধুনিক যুগের জটিল সমস্যাবলি—যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), আন্তর্জাতিক কূটনীতি, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং নাগরিক অধিকারের শরিয়াহ সম্মত আধুনিক সমাধানের জন্য সমসাময়িক আলেম সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে গতিশীল 'ইজতিহাদ' (আইনি গবেষণা) চালু করতে হবে [২]।
- **উগ্রবাদ দমন ও সঠিক প্রচার:** উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা খিলাফত ও জিহাদের যে মনগড়া ও ধ্বংসাত্মক অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ও বুদ্ধিজীবীদের কঠোর অবস্থান নিতে হবে [৩]। ইসলামের মূল শান্তিময়, মধ্যপন্থী (Wasaṭiyyah) ও ন্যায়ভিত্তিক রাজনৈতিক রূপরেখা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ও শিক্ষা কারিকুলামে জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে বিশ্বজুড়ে কৃত্রিমভাবে তৈরি হওয়া 'ইসলামোফোবিয়া' দূর করা সম্ভব হয় [৩]।
- **নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তা:** আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রে নারী ও অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল, সামাজিক মর্যাদা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণের অধিকারকে সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ও গ্যারান্টিযুক্ত করতে হবে, যা প্রাথমিক খিলাফতের যুগে চর্চা করা হতো [৫]।

৪. ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

এই গবেষণাটি মূলত আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও খিলাফতের মধ্যকার তাত্ত্বিক ও নীতিগত তুলনার ওপর আলোকপাত করেছে। তবে ভবিষ্যৎ গবেষকরা নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে আরও গভীর ও ফলপ্রসূ কাজ করতে পারেন:

1. আধুনিক জটিল আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) কাঠামোর সাথে সংঘাত এড়িয়ে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের স্বাধীন পররাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনার ব্যবহারিক মডেল তৈরি করা [৪]।
2. কোটি কোটি জনসংখ্যার আধুনিক রাষ্ট্রে সরাসরি ভোটারদের ম্যান্ডেট এবং মজলিস-উশ-শূরার সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ডের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক আইনি নকশা (Constitutional Blueprint) প্রণয়ন করা [৬]।

তথ্যসূত্র

1. **Al-Ghazali**, Ihya Ulum al-Din, Vol. 1, 1998
2. **আবদুল কাদের**, আধুনিক যুগে খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা, ২০১৮
3. **হাক্কানি**, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি, ২০২০
4. **Weeramantry**, Islamic Jurisprudence: An International Perspective, 1988
5. **Ibn Khaldun**, Al-Muqaddimah, trans. Rosenthal, 2005
6. **Al-Tabari**. The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk), Volume X: The Conquest of Arabia: The Riddah Wars. Translated by Fred M. Donner. State University of New York Press, 1993.
7. **Al-Tabari**, The History of al-Tabari, Volume XII: The Battle of al-Qadisiyyah and the Conquest of Syria and Palestine, translated by Yohanan Friedmann (State University of New York Press, 1992).
8. **Al-Tabari**, The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk), Volume XV: The Crisis of the Early Caliphate, translated by R. Stephen Humphreys (State University of New York Press, 1990).
9. **Al-Tabari.** *The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk)*, Volume XVI: *The Community Mutinous: The Caliphate of 'Ali.* Translated by Adrian Brockett. State University of New York Press, 1997. (সিফফিনের যুদ্ধ, খারেজীদের উত্থান এবং অভ্যন্তরীণ সংকটের প্রাথমিক আকর গ্রন্থ)।
10. **Ibn Kathir.** *Al-Bidayah wan-Nihayah*, Vol. 7 & 8. (খিলাফতের সূচনা, রাজধানী পরিবর্তন, নাহরাওয়ানের যুদ্ধ এবং খলিফার শাহাদাতের বিস্তারিত বিবরণ)।
11. **Madelung, Wilferd.** *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate.* Cambridge University Press, 1997. (অধ্যায়: 'The Caliphate of Ali'—তাঁর প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক কারণগুলোর গভীর একাডেমিক বিশ্লেষণ)।
12. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, আল-সিয়াসা আল-শরিয়াহ ফী ইসলাহ আল-রাঈ ওয়া আল-রাইয়্যাহ (বা সমসাময়িক বাংলা অনুবাদ সংস্করণ: খিলাফত ও রাজতন্ত্র: ইতিহাস ও পর্যালোচনা, গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস)।

13. মওদূদী, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা, (১৯৬৬), খিলাফত ও রাজতন্ত্র (Khilafat o Malukiyat), আধুনিক প্রকাশনী
14. Hitti, Philip K. (2002). History of the Arabs. 10th ed. Palgrave Macmillan. (আব্বাসীয় স্বর্ণযুগ এবং ১২৫৮ সালের বাগদাদ ধ্বংসের প্রামাণ্য বিবরণ)।
15. Al-Khalili, Jim. (2011). The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance. Penguin Press. (বীজগণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও কাগজের বিপ্লবের সহজ ঐতিহাসিক বিবরণ)।
16. Kramer, Martin S. (1986). Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congresses. Columbia University Press.
17. Finkel, Caroline. (2006). Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire. Basic Books. (উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান, ১৫১৭ সালের খিলাফত হস্তান্তর এবং আতাতুর্কের সংস্কারের সহজ ঐতিহাসিক বিবরণ)।
18. Al-Mawardi, A. H. (1996). The ordinances of government (W. H. Wahba, Trans.). Center for Muslim Contribution to Civilization. (Original work published ca. 1058)
19. Ibn al-Jawzi, A. A. (1985). Tarikh Umar ibn al-Khattab [The history of Umar ibn al-Khattab]. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Original work published ca. 1201).
20. Al-Bukhari, M. I. (1997). Sahih al-Bukhari (M. M. Khan, Trans.; Vol. 9). Darussalam. (Original work compiled ca. 846).
21. An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (1990). Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law. Syracuse University Press.
22. Hamidullah, Muhammad. (1975). The First Written Constitution in the World. Ashraf Printing Press. (মদিনা সনদের আইনি পর্যালোচনার জন্য)।
23. Al-Sijistani, Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Hadith No. 3052. (অমুসলিমদের অধিকার সংক্রান্ত হাদিস)।
24. Maududi, Sayyid Abul A'la. (1980). Rights of Non-Muslims in Islamic State. Islamic Publications.
25. Ibn Qayyim al-Jawziyya. (1997). Ahkam Ahl al-Dhimmah (Laws of the Protected People). Dar al-Ilm li al-Malayin.

26. Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrahim. (1352 AH). Kitab al-Kharaj (The Book of Land Tax). Al-Matba'ah al-Salafiyyah. (খলিফা ওমরের ইহুদি বৃদ্ধকে ভাতা দেওয়ার ঐতিহাসিক বিবরণ)।

27. Armstrong, Karen. (1997). Jerusalem: One City, Three Faiths. Ballantine Books. (খলিফা ওমরের জেরুজালেম চুক্তির ঐতিহাসিক বিবরণ)।

28. Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj. (2004). Manaqib 'Umar ibn al-Khattab (The Virtues of Umar ibn al-Khattab). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

29. আবু ইউসুফ, ইমাম (ইন্তেকাল ৭৯৮ খ্রি.)। কিতাবুল খারাজ (ইসলামি কর ও রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ)।

30. আল-কুরআনুল কারীম. (সূরা নম্বর: আয়াত নম্বর)।

31. আল-কাসানি, আবু বকর ইবনে মাসউদ. (১১৮৯ খ্রি.). বাদাউস সানাই ফি তারতীবিল শারাই. দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

32. আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল. (২০০২). সহীহ আল-বুখারী. আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ।

33. আল-মাওয়ার্দি, আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ. (২০০৬). আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ. দারুল হাদিস।

34. ইবনে হাজার আল-আসকালানি, আহমদ ইবনে আলী. (১৩৭৯ হিজরি). ফাতহুল বারী শারহু সহীহ আল-বুখারী. আল-মাতবা'আহ আস-সালাফিয়্যাহ।

35. ইবনে হাজম, আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ. (১০৬৪ খ্রি.). আল-মুহাল্লা বিল আছার (খণ্ড ৯). দারুল ফিকর।

36. ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক. (১৯৫৫). আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ (সিরাত ইবনে হিশাম). মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি।

37. নাসিফ, ফাতিমা ওমার. (১৯৯২). উইমেন ইন ইসলাম: আ সোসিও-পলিটিক্যাল পারসপেক্টিভ [Women in Islam: A Socio-Political Perspective]. ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইসলামিক বুকস।

38. মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আলা. (১৯৮০). ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্ব. শতাব্দী প্রকাশনী।

39. Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). Nasihat al-Muluk (Counsel for Kings). Translated by F.R.C. Bagley. Oxford University Press.

40. Asad, Muhammad. (1980). The Principles of State and Government in Islam. University of California Press.

41. Maududi, Sayyid Abul A'la. (1960). The Islamic Law and Constitution. Islamic Publications.

42. Qutb, Sayyid. (1993). Milestones. American Trust Publications.

43. Lewis, Bernard. (1988). The Political Language of Islam. University of Chicago Press.
44. Esposito, John L. (1998). Islam and Politics. Syracuse University Press.
45. Khan, Qamaruddin. (1985). The Political Thought of Ibn Taymiyyah. Islamic Research Institute, Islamabad.
46. Fukuyama, Francis. (1992). The End of History and the Last Man. Free Press.
47. Lapidus, Ira M. (1975). The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society. International Journal of Middle East Studies, 6(4), 363-385.
48. Ruhollah Khomeini. (1981). Islamic Government: Governance of the Jurist (Velayat-e Faqih). Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works.
49. Vogel, Frank E. (2000). Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia. Brill.
50. Giustozzi, Antonio. (2000). Emirate vs Republic: The Political Economy of the Taliban State. Oxford University Press.
51. Rousseau, Jean-Jacques. (1762). The Social Contract. (আধুনিক গণতন্ত্র ও জনমতের তাত্ত্বিক পর্যালোচনার জন্য)।
52. Khadduri, Majid. (1984). The Islamic Conception of Justice. Johns Hopkins University Press.
53. Chapra, M. Umer. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. The Islamic Foundation.
54. Gerges, Fawaz A. (2016). ISIS: A History. Princeton University Press.
55. Ibn Hajar al-Asqalani. (1328 AH). Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. Dar al-Jil.
56. Al-Alwani, Taha Jabir. (1993). Ijtihad. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
57. Ghannoushi, Rachid. (1993). Al-Hurriyat al-Ammah fi al-Dawlah al-Islamiyyah (Public Liberties in the Islamic State). Center for Arab Unity Studies.